ইউনিট ১: উন্নয়নের ধারণা, অর্থ এবং তত্ত্ব

ভূমিকা

শিক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণা লাভ করার পূর্বশর্ত হ'ল উন্নয়ন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা। এ ধারণা লাভ করতে গিয়ে সর্বাগ্রে আমরা পৃথিবীর ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রের দিকে তাকাই। কোন রাষ্ট্রগুলো ধনী এবং কোন রাষ্ট্রগুলো দরিদ্র এটা বলা খুব সহজ। সমাজে বা দেশে যে সম্পদ আছে, তার নির্দেশকসমূহ সমাজে তা কতটা পরিমান আছে তা চিহ্নিত করতে পারে। কিন্তু সম্পদ সমাজে কীভাবে বন্টিত হচ্ছে নির্দেশক সে সম্বন্ধে কোন তথ্য দেয় না, যেমন, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে উপার্জনের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সম্পদের কত অংশ বরাদ্দ, উৎপাদন কতটা এবং জনগণ ভোগ করছে কতটা সে সম্পর্কেও কোন তথ্য দেয় না। জনগণের জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে একই গড় আয়ের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্য আছে তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে, চাকুরী ও পেশাক্ষেত্রে নিয়োগ সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা প্রাপ্তিতে, বিশুদ্ধ বায়ু ও জলপান করার মধ্যে, অন্যায় ও অপরাধের হুমকির দিক থেকে এবং এরকম আরও অনেক কিছু। এসব দিক চিন্তা করে আমরা কীভাবে বলি কোন রাষ্ট্র কম উন্নত এবং কোন রাষ্ট্র বেশি উন্নত?

বিভিন্ন দেশ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিষয়কে প্রাধান্য দেয়। তাদের উন্নয়নের মাত্রা তুলনা করার পূর্বে আমাদের উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ কী তা বুঝতে হবে। সনাতন প্রথায় অর্থনীতি মানুষের উন্নত অবস্থা প্রকাশ করতে তার উপার্জনের উপর আলোকপাত করে। কিন্তু ১৯৮০ সালে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন দেখান যে, দারিদ্র্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার অন্যান্য ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার এবং এসব ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি শুধুই উপার্জনের উপর নির্ভর করে না। তার HDI (Human Development Index) এবং MPI (Multidimensional Poverty Index) উভয়ই উন্নয়নের এই উদারনীতি বোধকে প্রকাশ করে। আবার ১৯৯৯ সালে তিনি বলেন যে স্বাধীনতা উন্নয়ন ব্যতীত অন্য কোন পথ ধরে আসে না। অধ্যাপক সেনের দর্শন এখন সর্বজন গৃহিত। তিনি বলছেন যে, উন্নয়ন মানুষের উপর কীরূপ প্রভাব বিস্তার করছে তার উপর নির্ভর করে তার বিচার করা প্রয়োজন। উন্নয়ন শুধু মানুষের উপার্জনের পরিবর্তন নয়; তার অভিরুচি, সামর্থ্য ও তার স্বাধীনতার মানের পরিবর্তনও বটে এবং এসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন সমানভাবে সর্বত্র বন্টনের উপর নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন।

এই ইউনিটে উন্নয়নের অর্থ, ধারণা ও তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা সাতটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠগুলো হল:

পাঠ -১.১ উন্নয়নের অর্থ, সংজ্ঞা ও ধারণা এবং উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রকৃতি ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা কৌশল

পাঠ -১.২ উন্নয়ন সম্পর্কিত ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব

পাঠ -১.৩ উন্নয়নের আধুনিক তত্ত্ব: W.W. Rostow- উন্নয়নের ধাপসমূহ

পাঠ -১.৪ উত্তর আধুনিকায়ন

পাঠ -১.৫ উন্নয়নের নির্ভরশীলতা তত্ত্ব/মার্কসের দর্শন

পাঠ -১.৬ টেকসই উন্নয়ন ও শিক্ষা

পাঠ -১.৭ বিশ্বায়ন ও শিক্ষা

পাঠ ১.১: উন্নয়নের অর্থ, সংজ্ঞা ও ধারণা এবং উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রকৃতি ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উন্নয়নের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- উন্নয়নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- এসব দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা কৌশলের তুলনা করতে পারবেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী দশক থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ প্রবলভাবে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দিকে ঝুঁকেছিল। যুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিও এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর উপকুলীয় দেশগুলোতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এইসব দেশগুলোকে বিভিন্নভাবে অনুন্নত, নিম্ন উন্নয়নশীল এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এইসব দেশের নাগরিকগণ জাতি হিসেবে যথেষ্ট পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কিন্তু উন্নয়নের চাহিদার দিক থেকে তারা সমতলে অবস্থান করে। পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যাক্তিরা মনে করেন তৃতীয় বিশ্বের এইসব দেশ উন্নয়নের চাহিদার দিক থেকে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের অনুদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ দেখা যায়। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতাগণ দেশীয় উন্নয়নের জন্য তাদের নিজ দেশের নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করেন এবং সে উদ্দেশ্যে তারা নানাবিধ নীতিমালা আরোপ করেন ও প্রকল্প প্রণয়ন করেন। উন্নয়ন আকাঙ্খার সামগ্রিক অবস্থা বোঝার জন্য উন্নয়ন কী তা আমাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যদিও উন্নয়নের কোন বাঁধাধরা অর্থ নেই।

উন্নয়নকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, উন্নয়ন হল কোন রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিকের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে তাদের সন্তষ্টো করার জন্য এবং সরকারি চাহিদা অনুসারে তাদের কর্মে নিয়োজিত করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের উৎপাদনকে লক্ষ্য করে মানবসম্পদ উন্নয়ন ক্ষমতা।

উন্নয়ন সম্পর্কে এই সংজ্ঞাটি অর্থনীতি সম্পৃক্ত।

উন্নয়ন অর্থ ও উন্নয়নের সংজ্ঞা

প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। এর সমার্থক শব্দসমূহের মধ্যে আছে বিস্তৃতি, প্রসারণ, বিবর্তন, বৃদ্ধি, প্রগতি, অগ্রগতি, উত্তরণ, বিকাশ ইত্যাদি।

এর বীপরিতার্থক শব্দগুলোর মধ্যে আছে প্রত্যাবৃত্তি, পশ্চাদগমন করা, প্রত্যাবর্তন করা ইত্যাদি।

তবে সাধারণভাবে বলা যায় উন্নয়ন হল কোন অগ্রগতি যা কোন অগ্রসরমান অবস্থা বা কোন কিছুর বৃদ্ধি অথবা ব্যপকতার ফল স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আবার অভিধানে উন্নয়নকে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, "A process of unfolding, maturing and evolving." উন্নয়নের এই অর্থ ও ধারণা মানব সমাজের ক্ষেত্রেও একইভাবে

প্রযোজ্য। সুতরাং উন্নয়ন হচ্ছে এক অবস্থা বা স্তর থেকে উন্নত এবং কাঙ্ক্ষিত অবস্থা বা স্তরে উত্তরণ। আমরা পূর্বে দেখেছি বিশেষজ্ঞদের মতে উন্নয়ন অর্থ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশ তথা জাতিকে আধুনকায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি এসব নিশ্চিত করা। কিন্তু বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ উন্নয়নের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। অ্যাডাম স্মিথ জাতীয় উন্নয়ন বলতে সামগ্রিকভাবে পুঁজি সঞ্চয়নকে বুঝিয়েছেন। সেসময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবক্তারা মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধিকে জাতীয় উন্নয়ন মনে করতেন।

ষাটের দশকে জোরালোভাবে বলা হল জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা দেশের জনগণের মধ্যে বন্টিত হতে হবে। কিন্তু এটিও উন্নয়নের প্রকৃত চিত্র নয়। কারণ জাতীয় আয়কে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাথাপিছু আয় দেখালেও জনসাধারণ তার সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

সত্তরের দশকে উন্নয়ন সম্পর্কে কিছুটা নতুন ধারণা পাওয়া যায়। জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সামনে রেখে প্রবৃদ্ধির পুনর্বন্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাখ্যা দেয়া হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা সত্তরের দশকের উন্নয়নে বলা হলেও মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের কথা বলা হয়নি। জাতীয় আয় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় তবে তাকেই প্রকৃত উন্নয়ন বলা যাবে। উন্নয়নের নানাবিধ সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন–

১. নাটার মতে উন্নয়ন হ'ল প্রচ্ছন্ন উৎপাদনের একটি প্রসারণ।

২. শুমপিটারের মতে উন্নয়ন হ'ল বাহ্যিক উদ্দীপনার ফলশ্রুতি।

৩. কিল্ডালবার্গার ও হেগেলের মতে উন্নয়ন হচ্ছে কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি।

৪. বয়ার ও ইয়ামের মতে উন্নয়ন হচ্ছে জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধাদির পছন্দগত সম্প্রসারণ (Widening of Choices)।

৫. হার্বিসন ও মায়ার্স এর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা দীর্ঘকাল একটি দেশের মানুষের প্রকৃত মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

৬. Mahbubul Haq, Paul Stitin, James Grants and others (1970) বলেন, সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণই হ'ল অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

৭. ILO, World Employment Conference (1976) সত্তরের দশকের মৌলিক চাহিদাতত্ত্বের সঙ্গে আরও কিছু মাত্রা যোগ করে নতুন তত্ত্বের সন্ধান দেন। এই তত্ত্ব Basic Human Need Approach নামে পরিচিত। এ তত্ত্ব অনুসারে মানুষের জন্যে খাদ্য ও পুষ্টি, মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, গৃহায়ন ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টি করাই উন্নয়ন।

৮. অধ্যাপক ড. ইউনুস এর মতে উন্নয়ন অর্থ দেশের নিচের অর্ধেকাংশ (অর্থাৎ আয় বিন্যাসে যারা মধ্যম আয়ের নিচে অবস্থান করে) মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতি। তিনি দেশের নিচের অর্ধেকাংশ মানুষের মাথাপিছু আয়কে উন্নয়ন মাপার সূচক হিসেবে ধরেছেন। যে কর্মসূচি বা কর্মোদ্যোগ দেশের নিচের অর্ধেকাংশ মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে সেটাকেই শুধু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বলা যাবে।

৯. অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার (অর্থাৎ উন্নয়ন পরিমাপক হিসেবে মানুষের আয়) পরিবর্তন করেন। গবেষণার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে শুধু নিম্ন আয়ই নয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার পশ্চাদমুখীতাই দারিদ্রের অন্যতম কারণ। তিনি বলেন, মানুষের জীবনযাত্রায় যা প্রভাব

বিস্তার করে তার দ্বারাই উন্নয়ন পরিমাপ করা কর্তব্য। শুধু আয়ের উর্ধমুখীতা নয়, মানুষের ইচ্ছা, ক্ষমতা ও স্বাধীন সত্ত্বার বিচারে তার উন্নয়নের মাত্রা পরিমাপ করা হয়।

উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণা

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন মনে করেন কোন জাতি যদি কোন সময়ের জন্য উন্নত জীবনযাপন করে তবে তাকে উন্নয়ন বলা যাবে না। উন্নয়নের গূঢ় অর্থ হল ইতিবাচক উন্নত পরিবর্তনের স্থায়ীত্ব (Development carries a connotation of lasting change)। যেমন, সরকার যদি জনসাধারণকে পানির পাম্প বিতরণ করে, তবে যতদিন এই বিতরণ চলবে ততদিন তাদের জীবনযাত্রায় পানির কোন অভাব থাকবে না। কিন্তু যখন এই সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে তখন মানুষের দুরবস্থা ফিরে আসবে। সুতরাং এ ধরনের বিতরণ বা সরবরাহ কোন মতেই উন্নয়নের সূচক নয়। সে কারণে তিনি বলছেন অবস্থার স্থায়ীত্বই মুখ্য কথা। যা জনসাধারণের জীবনে শুধু অথনৈতিক ক্ষেত্রেই না, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একটি টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও সুদূর প্রভাব বিস্তার করে।

আবার ড. ইউনূস মনে করেন অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের সর্বনিম্ন অবস্থানে যারা জীবনযাপন করে তাদের অবস্থার উন্নতি না হলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে বলা যায় না। তার মতে ধনী দরিদ্রের একটি নির্দিষ্ট বিভাজন থাকা প্রয়োজন। সমাজের শতকরা ৫০ ভাগ জনগণকে দরিদ্র ধরা যেতে পারে। তিনি মনে করেন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে ৫০% জনগোষ্ঠিকে বিবেচনায় আনতে হবে। এই ৫০ ভাগ জনগণের মধ্যে যারা অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন অবস্থানে আছে, তাদেরকে লক্ষ্য করে পরিকল্পনা করতে হবে। সার্বিকভাবে দারিদ্র্যের জন্য কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা করলে তাদের মধ্যে যারা একটু ভাল অবস্থায় আছে তারাই লাভবান হয়। সুতরাং পরিকল্পনা করতে হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থনীতির সবচেয়ে নিম্নস্তরে অবস্থানকারী জনগণের জন্য।

সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দির শেষার্ধে এসে উন্নয়নের ধারণা আরও সম্প্রসারিত রূপ নিয়েছে। উন্নয়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা মানুষকে তার পছন্দমতো জীবনযাত্রার সুবিধা ও মান বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়- " Process of enlarging peoples choices." (UNDP- 2002)

অতএব উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে জাতির উন্নয়ন হল একটি অব্যাহত পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটবে, সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে, সম্পদের সুষম বণ্টনের দ্বারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে। সেইসাথে জনগণের পছন্দমতো জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা বাছাই করার ক্ষমতা বাড়বে।

উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উন্নয়নমুখী কৌশল

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ আজ তাদের নিজস্ব ভূখন্ডে স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। মানুষ আজ স্বাধীনচেতা, গণতন্ত্রমনা। রাজনীতিবিদগণ চান দেশে রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করুক। শিল্পপতি, কৃষিবিদ তাদের উৎপাদন উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশকে উন্নত দেখতে চায়। সর্বোপরি মানুষ চায় নিরাপদ সমাজ, শান্তিময় সহাবস্থান। প্রক্রিয়া, মাধ্যম এবং কৌশল ভিন্ন হলেও সবার লক্ষ্য উন্নয়ন। তাই জাতীয় উন্নয়ন বলতে ব্যাপক অর্থে একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অগ্রগতিকে বোঝায়। বিশ্বেও সব দেশ আজ উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। কেউ ধীরে এগোচ্ছে, আবার কেউ উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছে। এই উন্নয়নের চিত্র থেকে বিশ্বকে উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র তথা জাতিতে ভাগ করা হয়েছে।

উন্নত জাতি

শিক্ষার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করে, উপযুক্ত কৌশল প্রয়োগ করে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে যারা সক্ষম হয়েছে তারাই উন্নত জাতি বলে অভিহিত। এসব জাতি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে, মূলধন তৈরি করে উল্লেখযোগ্যভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

উন্নত জাতি যেমন- ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান এইসব দেশ পূর্বে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানাবিধ কর্মতৎপরতার উদ্যোগ গ্রহণ করত। এর জন্য মানুষের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শিল্প-কারখানা ও নানা ধরনের প্রকল্প স্থাপনের দিকেই ছিল তাদের প্রচেষ্টা। কিন্তু অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের HDI (Human Development Index) প্রবর্তনের পর থেকে তারা মানুষের মৌলিক চাহিদার স্থায়ী পূরণের দিকে নজর দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে এসব দেশ সাধারণ নাগরিকের খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রদান নিশ্চিত করেছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা, বাসস্থান সমস্যার সমাধান, জনগণের মুক্ত ও স্বাধীনভাবে মতামত রাখার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ও মানুষকে নিরাপদ জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলার ব্যবস্থা করেছে। রাষ্ট্রীয় এ উদ্যোগে উন্নত দেশের জনসাধারণ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করেছে। সাধারণ ও কর্মমুখী শিক্ষা কর্মসংস্থান বিশেষ করে আত্মকর্মসংস্থানে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ফলে সমগ্র জাতি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে একসাথে এগিয়ে যেতে পারে।

অনুন্নত জাতি

যে সব দেশের জনসাধারণ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করছে তাদেরকে অনুন্নত জাতি বলে। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এ জাতির যথোপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব থাকে, ফলে তাদের মাথাপিছু আয় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম থাকায় তারা মানবেতর জীবনযাপন করে। নিরক্ষতা, ক্ষুধা, দারিদ্র, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর অভিশাপে এরা জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে পঙ্গু ও পরনির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিনের দারিদ্র ও অশিক্ষার কষাঘাতে এদের জীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। নিরক্ষতা, কর্মদক্ষতার অভাব, কৃষি ও শিল্পের অনগ্রসরতা, সম্পদের স্বল্পতা, স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টি, জনসংখ্যা সমস্যা ইত্যাদি বহু রকম সমস্যা ঐ সব দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যহত করেছে।

অনুন্নত দেশগুলোর অন্যতম সমস্যা হল অবকাঠামোগত অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে তারাও উন্নত দেশের মতো এইচ.ডি.আই গ্রহণের পক্ষপাতী, কিন্তু এটি গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করার মতো অর্থনৈতিক বা সামাজিক শক্তি তাদের নেই। সে কারণে তারা চেষ্টা করে নিজ দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান করা। এ উদ্দেশ্যে তারা নানা ধরনের অবকাঠামোগত ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং নিজ দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু জনগণের অশিক্ষা, প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব তাদের কর্মসংস্থানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা জানি অনুন্নত জাতি বিদেশী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে তাদের একটি বড় সমস্যা হল দুর্নীতি পরায়নতা। দেখা যায় অনুদানের সিংহভাগ প্রশাসনিক আত্মসাতের ভোগে চলে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ দারিদ্রের নির্মম কষাঘাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। অনুন্নত জাতির উদাহরণ যেমন, কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে, কঙ্গো ইত্যাদি।

উন্নয়নশীল জাতি

অনুন্নত জাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে উপরে ওঠার ইচ্ছায় যারা সচেষ্ট তাদের উন্নয়নশীল জাতি বলে। এ জাতি নিজেদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি করার অভিপ্রায়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ফলে তাদের

জীবনযাত্রার মান উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। এ ছাড়াও উন্নয়নশীল দেশগুলো পশ্চিমা তথা উন্নত দেশের উন্নয়ন মডেল অনুসরণ করে নিজেদের উন্নয়নের চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়। তথাপি এ ধরনের দেশগুলো উন্নত জাতির উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তার অন্যতম কারণ এসব দেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে ধর্মান্ধতায় নিমজ্জিত থাকে। উপর্যুপরি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা, একনায়কতন্ত্র, পারস্পারিক রেষারেষি, শোষণ ও নানাবিধ অনৈতিক কর্মকাণ্ড জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। ফলে অধিকাংশ মানুষ সার্বিকভাবে দুরাবস্থার নিচের সীমায় অবস্থান করে এবং অনেক চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণের পরেও উন্নয়নের সর্বচ্চো শিখরে পৌঁছতে পারে না।

আমরা দেখেছি উন্নয়নশীল জাতি অনুন্নত জাতির তুলনায় কিছুটা ভাল অবস্থায় অবস্থান করে। এখানে উন্নতির জন্য তারা সর্বাগ্রে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি ও সেই সম্পদ ব্যবহার করে জাতীয় উন্নয়নের দিকে নজর রাখে। সাধারণভাবে এসব দেশে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। যেমন, আমরা বাংলাদেশের কথা বলতে পারি যে এখানে শিক্ষা নির্দিষ্ট একটি স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে, আবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মাধ্যমে মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে খাদ্যেও বাংলাদেশ স্বয়ং সম্পূর্ণ। এর সাহায্যে আমরা উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক শক্তির একটি চিত্র উপলব্ধি করতে পারি। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কেন্দ্রিয় ব্যাংক সবসময় একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকগুলো দেশের মুদ্রামান স্থিতিশীল রেখে অর্থনৈতিক অবস্থাকে চলমান রাখে। এ কারণে দ্রব্যমূল্য স্ফিতি বাজারকে গ্রাস করে না। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে মানুষ স্বস্তি লাভ করে। তারপরেও উন্নয়নশীল দেশ উন্নত দেশের অনুদান ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এর অন্যতম কারণ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সেখানে দেখেছি মানুষের দূনীতিপরায়নতা, আমলাতান্ত্রিকতা ইত্যাদি জটিল ব্যবস্থা উন্নয়নের যাত্রাপথকে কণ্টকময় করে তোলে। বাংলাদেশ ছাড়াও উন্নয়নশীল জাতির উদাহরণ হল নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কেবল অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে যে দূর্নীতি হয়, উন্নত দেশে হয় না তা নয়। তবে উন্নত দেশসমূহ যে দূর্নীতি করে তার ফলাফল তাদের দেশ ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যেমন, আমেরিকার ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের অস্ত্র ব্যাবসায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে জনসাধারণের মধ্যে তা বণ্টনের কথা বলা হয়েছে কোন দশকে?
   ক. সত্তর
   খ. ষাট
   গ. নব্বই
   ঘ. আশি

২. উন্নয়ন হল বাহ্যিক উদ্দীপনার ফলশ্রুতি- এ কথা কে বলেছেন?
   ক. মায়ার্স
   খ. বয়ার
   গ. শুমপিটার
   ঘ. হার্বিসন

৩. ড. ইউনুস মনে করেন অর্থনীতির সুফল নিম্নস্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে
   ক. সবার আগে
   খ. একই সাথে
   গ. যে কোন সময়
   ঘ. সর্বশেষে

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অ্যাডাম স্মিথ পুঁজি সঞ্চয়ন বলতে কি বুঝিয়েছেন?
২. উন্নয়নের একটি সংজ্ঞা লিখুন।
৩. অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মতে উন্নয়নের টেকসই অবস্থা কী? ব্যাখ্যা করুন।
৪. অনুন্নত জাতি কীভাবে তাদের দেশের উন্নতির প্রচেষ্টা করে বুঝিয়ে লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পৃথিবীর অনুন্নত দেশের উন্নয়নমূলক অবস্থা বিশ্লেষণ করুন।
২. উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা কতটা বাস্তবসম্মত ও সার্থক আলোচনা করুন।

পাঠ ১.২: উন্নয়ন সম্পর্কিত ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উন্নয়ন সম্পর্কিত ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বসমূহের নাম বলতে পারবেন;
- প্রত্যেকটি তত্ত্বের বিভিন্ন ভাগ আলোচনা করতে পারবেন;
- ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বসমূহ কীভাবে উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

উন্নয়ন

উন্নয়নের অন্তর্নিহীত অর্থ যদি আমরা না উপলব্ধি করি তাহলে উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আধুনিক কালে পৃথিবীব্যাপি যে অপুষ্টি, দারিদ্র্য, রোগবালাই, অশিক্ষা, বেকারত্ব, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বা বৈষম্য বিরাজ করছে তা উন্নয়নের জন্য হুমকি স্বরূপ। যদি সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর অগ্রগতি ও প্রগতির দিকে দৃষ্টি দিই তবে উন্নয়নের যাত্রা এগিয়ে চলেছে এ কথা বলতে হয়। আর যদি মানুষের কর্মসংস্থান, বিচার ব্যবস্থা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের দিকে তাকাই তবে বলতে হবে উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, নয়তো বলব উন্নয়ন আংশিক সফল হয়েছে।

আমরা দেখেছি উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি একটি জরুরি বিষয়, কিন্তু এটাই একমাত্র বিষয় না। উন্নয়ন সম্পর্কে সবশেষ কথা হল মানুষের জীবন উন্নতির শিখরে পৌঁছায় যখন তার আর্থিক দিকের পাশাপাশি বস্তুগত এবং অন্যান্য পার্থিব সকল দিকের স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। সেজন্য উন্নয়নকে উপলব্ধি করতে হলে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় অবস্থার একটি বহুমাত্রিক দিকের নবসংগঠন ও নববিন্যাসের রূপ বুঝতে হবে। এছাড়াও এসব উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে, এমন কি তার বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং সামাজিক রীতিনীতিও বদলে যাবে। প্রত্যেক জাতি উন্নয়নের পিছনে ছোটে। যদিও ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা জাতীয় উন্নয়নের কথা বলি, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যহীন উন্নয়নের কথা ভাববার সময় এসেছে।

এই অধ্যায়ে আমরা কেন উন্নয়ন ঘটছে বা কেন ঘটছে না তা নিয়ে সাম্পতিককালের কিছু ঐতিহাসিক ও বৌদ্ধিক চিন্তন নিয়ে আলোচনা করব। এ উদ্দেশ্যে চারটি প্রধান ও স্বীকৃত উন্নয়ন তত্ত্ব আমাদের পড়তে হবে। একে উন্নয়নের ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব বলা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের চারটি স্বীকৃত তত্ত্ব: চারটি মতবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়নে চারটি প্রধান উন্নয়নভিত্তিক চিন্তন এবং মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে। এ চারটি মতবাদ হল:

1. The linear-stage of-growth model
2. Theories and patterns of structural change
3. The international dependence revolution
4. The neoclassical, freemarket-counterrevolution.

আধুনিককালে একটি নতুন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে যা এই চারটি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালের তত্ত্ববাদীরা মনে করেন উন্নয়ন হল কতগুলো সার্থক এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধাপ। পৃথিবীর সকল দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড এই ধাপগুলোর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। পূর্বে উন্নয়ন সম্পর্কে একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব ছিল যে উন্নয়নশীল জাতিকে অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক পরিমান সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন। দেখা যায় এই নীতি উন্নত বহু দেশ অনুসরণ করেছে। এভাবেই উন্নয়নকে দ্রুত ও সমষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি সমার্থক শব্দ বলা যায়। দু'টি চিন্তনের উপর ভিত্তি করে রৈখিক ধাপবিশিষ্ট উন্নয়ন মডেলটি (The linear-stage of-growth model) ১৯৭০ সালে প্রবর্তন করা হয়েছিল।

এক. প্রকৃত উন্নয়নশীল একটি দেশ যদি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগিয়ে যেতে চায় এবং উন্নয়নের একটি স্থায়ী রূপ প্রত্যাশা করে তবে তাকে অবশ্যই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় চলমান থাকতে হবে। এই চিন্তনটি Theories and patterns of structural change মডেলটিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

দুই. Theories and patterns of structural change মডেলটি মৌলিকত্ব ও রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি পরিচিত।

1. The Linear-Stage of-Growth Model

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর দরিদ্র জাতিগুলোর মধ্যে উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা যখন মূর্ত হয়ে উঠল, তখন শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনীতিবিদরা বেশ মুশকিলে পড়েছিলেন। কারণ আধুনিক অর্থনৈতিক সংগঠনবিচ্ছিন্ন কৃষিভিত্তিক দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করার জন্য কোন তাৎক্ষণিক ধারণা তাদের ছিল না। কিন্তু তাদের ছিল সেই সুউচ্চ পরিকল্পনার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা, যার সাহায্যে অ্যামেরিকার পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে ইউরোপিয়ান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়ন ছিল মাত্র কয়েক বছরের ব্যাপার। তাছাড়া এটা কী সত্যি নয় যে আজকের শিল্পোন্নত জাতিসমূহ একসময় অনুন্নত কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার আওতায় ছিল? এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে আসতে এইসব দেশগুলোর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মতো দারিদ্রপিড়ীত দেশগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়েছে।

রসটোর উন্নয়ন ধাপ

১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালে যুদ্ধ পরবর্তী উন্নত পৃথিবীব্যাপী যে বৌদ্ধিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, সেখানে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর উন্নয়ন প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ **উন্নয়নের ধাপ** মডেলটির জন্ম হয়। এর প্রবক্তা হলেন আমেরিকার অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক ওয়াল্ট. আর. রসটো (Walt. R. Rostow)। রসটো বলেন, **কতগুলো ধারাবাহিক ধাপ পার হয়ে অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশে পরিবর্তিত হয়, এবং প্রত্যেক জাতির অবশ্যই এ ধাপসমূহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়।** উন্নত দেশসমূহ প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে উন্নয়নের চূড়ান্ত ও টেকসই পর্যায়ে এসেছে। এবং অনুন্নত জাতিসমূহ, যারা পুরান সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করছে, তারা একইভাবে উন্নয়নের উচ্চ পর্যায়ে যেতে কয়েক ধাপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে উন্নয়নের চূড়ান্ত ও টেকসই পর্যায়ে পৌঁছোবে।

উন্নত দেশসমূহ থেকে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশে পুঁজি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পরিবহনের জন্য উন্নয়নমুখী Capital constraint ধাপসমূহ সুবিধাজনক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য এভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা পরের পাঠে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করব।

2. Theories and Patterns of Structural Change

অনুন্নত অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ গঠন তার প্রচলিত ও বর্তমান কৃষিভিত্তিক উপজীবিকার উপর জোর দিয়ে ও নির্ভর করে আধুনিক, অধিক নগরায়িত, অধিক শিল্পায়িত অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়। গাঠনিক পরিবর্তন মডেল এই পদ্ধতির (Mechanism) উপর প্রতিষ্ঠিত। এ পদ্ধতিতে আধুনিক-ক্ল্যাসিকাল (Neoclassical) মূল্যের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহৃত হয়। গাঠনিক পরিবর্তন মতবাদের দু'টি সুপরিচিত উদাহরণ আছে:

1. W. Arthur Lewis প্রণীত Two-sector surplus labor
2. Hollis B.Chenery প্রণীত patterns of development

W. Arthur Lewis প্রণীত Two-Sector Surplus Labor: এটি উন্নয়নের একটি তাত্ত্বিক মডেল। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ মডেলটি প্রণীত হয়েছিল। এ মডেল উন্নয়নের গাঠনিক পরিবর্তনের প্রাথমিক উপজিব্য অর্থনীতির উপর জোর দেয়। এটা পরে অনেক পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। এ মডেল অনুসারে অনুন্নত অর্থনীতির একটি খাত হ'ল প্রচলিত অধিক জনঅধ্যুসিত গ্রামীন উপজীবিকার খাত। এ খাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল এর প্রান্তিক উৎপাদন একেবারে শুন্যের কোঠায়। লিউইস এখানে 'উদ্বৃত্ত শ্রম' (Surplus Labor) কথাটি ব্যবহার করেছেন এজন্য যে এ শ্রমকে এখাত থেকে একেবারে উঠিয়ে নিয়ে কোন রকম অর্থনৈতিক ক্ষতি না করেই উচ্চ উৎপাদন সমৃদ্ধ আধুনিক নগরায়িত শিল্পোন্নত খাতে স্থানান্তরিত করা যায়।

এই মডেলটি শ্রমিক স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়া, পণ্যের উৎপাদন ও আধুনিক খাতে শ্রমিক নিয়োগ সবক'টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। কোন একটি খাতের উৎপাদন সম্প্রসারণের উপর নির্ভর করে তার শ্রমিক বদল বা স্থানান্তরকরণ ও আধুনিক খাতে নিয়োগ বৃদ্ধি এ দুটোই ঘটে। আধুনিক খাতের শিল্পে বিনিয়োগ ও পুঁজি সংগ্রহের হার দ্বারা এই সম্প্রসারণের গতি নির্ণয় করা হয়। এটা ধারণা করা যায় যে নগরভিত্তিক শিল্পোন্নত খাতে শ্রমিকদের মজুরী স্থির থাকে এবং কৃষিভিত্তিক খাতে গড় মজুরীর যে কিস্তি তা থেকে এ স্থির মজুরী নির্ণয় করা হয় (লিউইস মনে করেন শহরে শ্রমিকদের স্থানান্তরিত হওয়ার মূল্যস্বরূপ এবং এ কাজে উৎসাহ দেয়ার জন্য তাদের মজুরী কমপক্ষে গ্রামীণ গড় আয়ের ৩০% বেশি হবে)।

Hollis B. Chenery প্রণীত **Patterns of Development:** হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অর্থনীতিবিদ হলিস. বি. চেনেরী ও তার সহকর্মীবৃন্দ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গাঠনিক পরিবর্তনের এই উন্নয়ন প্রকৃতি মডেলটি প্রবর্তন করেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বহু উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন প্রকৃতির উপর গবেষণা করেছেন।

উন্নয়নের গাঠনিক পরিবর্তনের **Patterns of Development** বিশ্লেষণ মডেল অনুন্নত অর্থনীতির অর্থনৈতিক, শিল্প সংক্রান্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক গঠনের প্রচলিত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে নির্দিষ্ট সময়ে নতুন শিল্পে স্থানান্তরিত করার আনুক্রমিক প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করে। এ প্রক্রিয়াটি একটি স্বাভাবিক ইঞ্জিনের মতো চলতে থাকে। একটি প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে আধুনিকায়ন করতে হলে ভৌত ও মানবীয় উভয় প্রকার পুঁজি সঞ্চয়ের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক গঠনের একগুচ্ছ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। উৎপাদনের পরিবর্তন, ভোক্তার চাহিদার পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং আর্থসামাজিক বিষয়সমূহের পরিবর্তন যেমন- নগরায়ন, কোন দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বিতরণ ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যাবলি গাঠনিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। প্রায়োগিকভাবে গাঠনিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার উন্নয়নের প্রতি জোর দেয়। অর্থনৈতিক চাপ যেমন, দেশীয় সম্পদের দ্বারা বৃত্তি প্রদান, দেশের ভৌত এবং জনসংখ্যাগত অবস্থা এবং প্রশাসনিক চাপ যেমন, সরকারি নীতি ও উদ্দেশ্য এ সবকিছুই অভ্যন্তরীণ দিকের অন্তর্ভুক্ত। দেশের ভিতরে বহির্দেশের পুজি প্রবেশ, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এসব কিছু উন্নয়নের আন্তর্জাতিক দিকের অন্তর্ভুক্ত।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে উন্নয়নের পার্থক্যের মাত্রা হল এই অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাপের কারণ। উন্নয়নশীল দেশের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তোরণের যে ক্রান্তিকাল তা তৈরি হয় এই আন্তর্জাতিক চাপের কারণে। শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশের পুঁজি, প্রযুক্তি ও তৈরিকৃত যন্ত্রপাতির উৎস এবং সেইসাথে রপ্তানির জন্য তারা বাজার তৈরি করে। এভাবে তারা তাদের নিজেদের উন্নয়নে যে ক্রান্তিকাল পেয়েছিল তার থেকে অনেক দ্রুত এরা (উন্নয়নশীল দেশ) উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশ যা তাদের উন্নতির পথে পাথেয় হয়ে যায়। আমরা এ বিষয়টি ধাপবিশিষ্ট মডেলে পাইনি।

3. The International Dependence Revolution

১৯৭০ সালে আন্তর্জাতিক নির্ভরতা বিপ্লব (The international dependence revolution) মডেলটি ক্রমবর্ধমান সমর্থনে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের বুদ্ধিজীবিদের মাঝে গড়ে ওঠে। এই মডেলটি উন্নত দেশগুলোর সাথে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পারস্পারিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেছে। দেখা যায় উন্নত বিশ্ব সবসময়ই উন্নয়শীল দেশসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শিল্পোন্নত দেশসমূহের উপর নির্ভর করে পথ চলে। এই নির্ভরতা আন্তর্জাতিক বাজারে খুব খারাপভাবে প্রতিক্রিয়া করে। এই মতবাদের ভিতরে তিনটি চিন্তন পাওয়া যায়:

1. The Neocolonial dependence model
2. The False-paradigm model
3. The Dualistic Development thesis

1. The Neocolonial Dependence Model

এই মডেলটি মার্কসীয় চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বলা হচ্ছে অসম আন্তর্জাতিক পুঁজি ব্যবস্থার কারণে দরিদ্র দেশগুলোতে অনুন্নয়ন বিরাজ করে। ধনী দেশগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে দরিদ্র দেশকে শোষণ করে এবং অবহেলা করে। ফলে পৃথিবীতে ধনী-দরিদ্র দেশের এই সহাবস্থানে অসম শক্তির যে সম্পর্ক অর্থাৎ আবহেলা ও শোষণ প্রভাব বিস্তার করে। অনুন্নত দেশগুলো আত্মনির্ভরশীল হতে চায়, কিন্তু তাদের এই সম্পর্কের কারণে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। আবার উন্নয়নশীল দেশের উঁচু পর্যায়ে যারা আছে যেমন- ভূমিমালিক, মিলিটারী, শাসক, ব্যবসায়ী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ইউনিয়ন নেতা ইত্যাদি, এরা উচ্চ বেতন, সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদি ভোগ করে সমাজের ক্ষমতাবান এবং শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই ক্ষমতাবান এবং শাসক শ্রেণীর, জেনে বা না জেনে আন্তর্জাতিক অসম পুঁজি ব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের স্থায়ী আগ্রহ থাকে, যা তারা অনুসরণ করতে পছন্দ করে। প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তারা আন্তর্জাতিক ক্ষমতাসম্পন্ন দলকে যেমন, বহুজাতিক নগর শাসক শ্রেণী, বিশ্ব ব্যাংক বা আই.এম.এফ ইত্যাদির সেবা করে এবং যাবতীয় সুবিধা ভোগ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই সব প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে অর্থকরী দিক থেকে উন্নত ও পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

এইভাবে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে অনুন্নয়ন উন্নত ও পুঁজিবাদী বিশ্বের সৃষ্টি করা এক ধরনের ব্যবস্থা। The international dependence revolution মতবাদটি এখানেই ধাপবিশিষ্ট মডেল ও গাঠনিক পরিবর্তন মডেল থেকে ভিন্ন, যা অনুন্নয়নের কারণ হিসেবে অপর্যাপ্ত সঞ্চয় ও শিক্ষা ও দক্ষতাহীনতাকে দোষারোপ করে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ বা কমপক্ষে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিশ্বের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা এবং উন্নত দেশ ও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার প্রভাব থেকে বিমুক্ত থাকা।

2. The False-Paradigm Model

এই মডেলটি কোন স্বাভাবিক বিষয় সম্বন্ধে মানুষকে ভ্রান্ত ধারণা দেয়। কোন বিষয় সংক্রান্ত কোন গ্রাফ বা ছবি যাই দেখানো হোক না কেন তা মানুষের মধ্যে এমন একটি ধারণা গড়ে তোলে যা প্রকৃতপক্ষে অন্যরকম। যেমন, আমরা যখন একটি বস্তি দেখি তখন সাধারণভাবে আমরা মনে করি বা একটা চিত্র মানসপটে থাকে যে এটা এমন একটি জায়গা যেখানে শুধুই ময়লা, আবর্জনা সহকারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দরিদ্র মানুষ বসবাস করে। সেখানে শিক্ষার আলো নেই, আধুনিক প্রযুক্তি নেই ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাটি ভুল। ঐ বস্তির মধ্যেও এমন মানুষ থাকতে পারে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকছে, টেলিভিশন দেখছে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে, এমন কি কোন একটা সময় ঘরে তারা বিদ্যা শিক্ষায় ব্যস্ত থাকছে। এটাই প্রকৃত চিত্র, যা আপাতভাবে মনে হয় না। এই মডেলটি প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না বলে একে False-paradigm model বলে।

3. The Dualistic Development Thesis

সাধারণভাবে কোন একটি উন্নয়নশীল দেশে সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এর অন্যতম লক্ষ্য হল দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। কিন্তু আমরা জানি যে কোন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে মানুষের মধ্যে শ্রেণিগত বৈষম্য বিরাজ করে। অর্থাৎ কিছু মানুষ থাকে যারা দেশের উঁচু শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে এবং স্বাভাবিকভাবেই অন্যটি হল নিচু শ্রেণি। উঁচু শ্রেণির মানুষ উচ্চ বেতনভোগী কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, মিলিটারী বা রাজনৈতিক নেতা। তারা দেশের এবং উন্নত বিশ্বের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। উন্নয়নমুখী কোন প্রকল্প বা কর্মকাণ্ড যখন প্রবর্তন করা হয় তখন এ দুই শ্রেণির মানুষই লাভবান হয়। একে বলে Dualistic Development। তবে উঁচু শ্রেণি আরও বিত্তবান ও সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে দুয়ের মধ্যে যে বৈষম্য তা স্থির থাকে অথবা কখনও কখনও এ বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশে গৃহিত উন্নয়নমুখী প্রচেষ্টা মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করতে পারে না। এটাই Dualistic Development Thesis এর মূল কথা।

The Neoclassical, Free market- Counterrevolution

ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের এই মতবাদটি উন্নত দেশের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। তারা মনে করে যে, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পিছিয়ে থাকে তার অন্যতম কারণ হল মুক্ত বাজার অর্থনীতির অভাব। উন্নয়নশীল দেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সঠিক রূপ নষ্ট করে ফেলা হয়। দেখা যায় এসব দেশে যারাই ব্যবসা করতে যায় তারা সরকারি হস্তক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ ব্যবসা ক্ষেত্রে অর্থনীতির বাজারকে মুক্ত না করে নানাভাবে সরকারি বিধি-নিষেধ ও আইন দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা হয়। অর্থনীতির বাজার আমলাতন্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত থাকে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন- ব্যয় বৃদ্ধি, অনেক সময় ব্যয়, শ্রমের অপচয় ইত্যাদি। কোন প্রকল্প হাতে নিলে গ্যাস সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং সরকারি হস্তক্ষেপের দরুণ সময় অনেক বেশি লাগে। এছাড়াও প্রকল্পের স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মোটা অঙ্কের চাঁদা দিতে হয়। ফলে কাজ পিছিয়ে যায়, অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও বাজার আমলাতান্ত্রিকতার হাতে কুক্ষিগত হয়ে থাকে। একারণে উন্নয়ন সম্ভব হয় না।

উন্নত দেশ মনে করে ব্যবসা ক্ষেত্রে বাজার মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ যে কেউ যখন ইচ্ছা ব্যবসা করতে পারবে এবং নিজ প্রচেষ্টায় সে তার প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। যে কোন দেশ অন্য যে কোন দেশের সাথে ব্যবসা করতে পারবে। এখানে তৃতীয় কোন শক্তি কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

সাধারণভাবে দেখা যায় ব্যবসায়ীরা কোন রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ মানুষ তার নিজ স্বার্থে কোন জনপ্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। ব্যক্তি নির্বাচিত হলে সে তার ব্যবসা কাজে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ

সুবিধা ভোগ করতে পারে। এর ফলে আনেক অযোগ্য ব্যক্তি প্রকল্প বা ব্যবসা প্রাপ্তির সুবিধা পেয়ে থাকে এবং ব্যবসা ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সুতরাং উন্নয়নের জন্য অর্থনীতিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন যে কোন ব্যবসা করতে গেলে তার জন্য যে সাহায্যকারী উপাদান বা সুবিধা প্রয়োজন হবে তা সেই অর্থনীতি যোগান দেয়ার যোগ্যতা রাখবে। অর্থাৎ অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, যেন কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে তা ব্যবহার উপযোগী থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উন্নয়ন সম্পর্কে সর্বশেষ কথা কোনটি?
ক. অর্থনৈতিক উন্নতি
খ. বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উন্নতি
গ. বস্তুগত ও পার্থিব উন্নতি
ঘ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি

২. উন্নত দেশসমূহ প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে উন্নয়নের চূড়ান্ত ও টেকসই পর্যায়ে এসেছে-এখানে প্রারম্ভিক পর্যায় কোনটি?
ক. ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক সমাজ
খ. অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠি
গ. সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ
ঘ. প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা

৩. কোনটি মার্কসীয় চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত?
ক. নগরায়ন একটি অর্থনৈতিক কাজ
খ. গ্রামীণ উপজীবিকা অনুন্নত অর্থনীতির খাত
গ. উন্নত রাষ্ট্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের উপর প্রভাব রাখে
ঘ. অনুন্নয়ন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা দ্বারা সৃষ্ট

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. W. Arthur Lewis এর Two-sector surplus labor কী? ব্যাখ্যা করুন।
২. গাঠনিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝেন? গাঠনিক পরিবর্তন মডেলটি কোন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত?
৩. Dualistic Development thesis এর মূল বিষয় আলোচনা করুন।
৪. কখন মানুষ কোন বিষয় সম্পর্কে ভুল ধারণা পায়? কীভাবে এটি ঘটে বুঝিয়ে লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে আপনি উন্নয়নের একটি একক তত্ত্ব দিন এবং আপনার তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিন।
২. উন্নয়নের জন্য ধাপ উন্নয়ন তত্ত্ব, গাঠনিক পরিবর্তন তত্ত্ব এবং আন্তর্জাতিক নির্ভরতা তত্ত্বের Neocolonial dependence এবং False-paradigm-এর ধারণাসহ পার্থক্য নির্ণয় করুন। এর মধ্যে উন্নয়নশীল জাতির উন্নয়নের জন্য আপনার মতে কোন তত্ত্বটি সবচেয়ে উপযোগী? আপনার উত্তর ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ১.৩: উন্নয়নের আধুনিক তত্ত্ব: W.W. Rostow উন্নয়নের ধাপসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উন্নয়ন সম্পর্কিত আধুনিক তত্ত্ব কী তা বলতে পারবেন;
- রসটো প্রবর্তিত আধুনিক তত্ত্বের পাঁচটি ধাপের নাম বলতে পারবেন;
- প্রত্যেকটি ধাপের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন এবং
- রসটোর উন্নয়ন ও শিক্ষার সম্পর্ক সনাক্ত করতে পারবেন।

ভূমিকা

আধুনিক তত্ত্ব বলতে সেই তত্ত্বকে বোঝায় যা বর্তমান উন্নত জাতিগুলো অনুসরণ করে এসেছে এবং উন্নতি করতে হলে উন্নয়নশীল জাতিকে অবশ্যই তা অনুসরণ করতে হবে। আমরা যাকে উন্নয়ন তত্ত্ব বলে জানি তা আর্থসামাজিক তত্ত্ব বলে পরিচিত। এসব তত্ত্ব উন্নয়নশীল জাতিকে আধুনিকায়ন ও টেকসই উন্নয়নে উন্নত করার জন্য উন্নত দেশের ইতিবাচক ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য উন্নত দেশসমূহ তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষা নিতে বলে। আধুনিক তত্ত্বে এও বলা হয় যে আধুনিক তত্ত্ব অনুসরণে উন্নয়নশীলদেশগুলো খুব দ্রুত উন্নতি করতে পারে, এমনকি উন্নত জাতির পর্যায় পৌঁছতে তাদের খুব বেশি সময় লাগবে না।

রসটো (W.W. Rostow)-র **অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধাপ** মডেলটিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রধান ঐতিহাসিক মডেলসমূহের মধ্যে অন্যতম আধুনিক তত্ত্ব হিসেবে ধরা হয়। এ মডেলটি আমেরিকার অর্থনীতিবিদ ওয়াল্ট. হুইটম্যান. রসটো (Walt Whitman Rostow) ১৯৬০ সালে প্রবর্তন করেন। এই মডেল অনুসারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভিন্ন দৈর্ঘের পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

১. সনাতন সমাজ ব্যবস্থা (Traditional Society)
২. উন্নয়ন সূচনার পূর্বশর্ত (Preconditions for Take Off)
৩. উন্নয়ন সূচনা (Take Off)
৪. পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা (Drive to Maturity)
৫. ভোগস্তর (Age of High mass consumption)

১. সনাতন সমাজব্যবস্থা (Traditional Society)

প্রথম ধাপকে সনাতন সমাজব্যবস্থা বা Traditional Society বলে। উন্নয়নশীল দেশগুলো সনাতন সমাজ ব্যবস্থার আওতায় পড়ে। এসব দেশে জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। এখানে সেনাব্যবস্থা ও ধর্মীয় কাজে অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হয়। যেসব সমাজ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, উন্নয়নের এই ধাপটি সেই সমাজের উন্নতির জন্য প্রবর্তিত। এসব সমাজের মানুষ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। মানুষ যে তার নিজ জীবনধারা বদলে ফেলতে পারে একথা তারা বিশ্বাস করে না। কারণ তারা জাদুটোনা, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তাদের দুরাবস্থা দূর করতে এবং বর্তমান অবস্থার উন্নতি করতে তারা অপারগ। তারা

বিশ্বাস করে কোন বস্তু বা কোন কিছুর প্রাপ্তি ঐশ্বরিক কারণে ঘটে, এখানে মানুষের কোন ক্ষমতা কাজ করে না বা মানুষের কোন হাত নেই। তার অর্থ এই না যে এখানে অর্থনীতির উৎপাদন থেমে থাকে, বরং কৃষি উৎপাদন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকার ফলে অর্থনীতিও এগিয়ে চলে। তবে সনাতন চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাব সে অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এ বিষয়টিও বুঝতে হবে যে, সনাতন সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং কৃষক সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রকার জলসেচ পদ্ধতি ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সচেতন। অর্থাৎ এখানে প্রযুক্তির ব্যবহার আছে, তবে তা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ক্রমাগত বিকাশের সাথে এদের পরিচয় নেই, এবং এটাই এদের উন্নতির পথে চরম বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রসটো বলছেন যে এসব দেশে বাণিজ্য চলে প্রধানত বিনিময় প্রথায়, সেখানে অর্থনীতির উন্নতি ঘটে না। সে কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষিক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগ ৫% এরও কম। এছাড়া যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, জনসংখ্যার স্ফীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী যেমন- কলেরা, ডেঙ্গু, এইডস ইত্যাদির কারণে জীবনযাত্রার মান ও আর্থসামাজিক অবস্থার অবণতি ঘটে। এরফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও স্থিতিশীল থাকতে পারে না এবং এর উন্নয়নও ঘটে না। এসব দেশে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব এবং মানুষের পুরানো চিন্তাধারা সংবলিত মানসিক অবস্থার দরুণ তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হয় না। এখানে জমির মালিক ও জোতদাররা নোংরা রাজনীতির প্রভাব বিস্তার করে। মোট কথা এসব ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার প্রচলনই বেশি। এ কারণে অর্থনৈতিক প্রগতি থেমে থাকে, এগিয়ে চলে না। সুতরাং Traditional Society র প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল:

- কৃষিভিত্তিক উপজীবিকা যা এই ধাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা প্রাথমিক অর্থনৈতিক খাত তৈরি করে।
- খুবই সীমিত প্রযুক্তির ব্যবহার।
- সামাজিক স্থিরতা দেখা যায়, যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন অগ্রযাত্রা নেই, বরং নেতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

২. উন্নয়ন সূচনার পূর্বশর্ত (Preconditions for Take Off)

উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক অগ্রগতির দ্বিতীয় ধাপ হ'ল উন্নয়ন সূচনার পূর্বশর্ত বা Preconditions for take off। এই ধাপে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধির পথ ধরে এগিয়ে চলে। রসটো বলছেন এই ধাপে উন্নত উৎপাদন কৌশলের ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মৌলিক কাঠামোয় পরবির্তন আসে। এই পরিবর্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক দুভাবেই ঘটে। খনিজ শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন, কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি বৃদ্ধি, অন্যান্য ক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ খাতে উন্নয়ন এসবই এই ধাপের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সনাতন সমাজ থেকে উন্নয়ন সূচনা ধাপে অগ্রসর হওয়ার জন্য এই ধাপে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে যাত্রা, নিজ দেশের ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্য ও অন্যান্য ব্যবসা ক্ষেত্রে বিস্তৃতি, ভূমি মালিক ও জোতদারদের সম্পদ বিনষ্টকরণ কমে আসা, উদ্বৃত্ত সম্পদের শিল্প, অবকাঠামো, নিজ অবস্থার স্থায়ী পরিবর্তনে বিনিয়োগ ইত্যাদি। এই ধাপে ভূমি মালিক ও জোতদাররা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষির উন্নয়ন ঘটায় এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদন ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। এর জন্য তারা প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং নিজেদের কর্মকান্ডের উন্নয়ন ঘটায়। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে জাতীয় আয়ের ৫% এর বেশি বিনিয়োগ করা হয়। শিল্পক্ষেত্রকে অগ্রসর করার জন্য কৃষি কর্মকাণ্ডই প্রধান ও মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং Preconditions for take off ধাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

- শিল্পখাতে কাঁচামালের চাহিদা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করে।
- বাণিজ্যভিত্তিক কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন হয় এবং উদ্বৃত্ত শস্য বিদেশে রপ্তানী করা হয়।
- উৎপাদন বৃদ্ধির ভৌত পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ সম্পসারণ করা হয়।

- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হয়।
- সামাজিক স্থিরতা ধ্বংস হতে শুরু করে।
- পুরানো সমাজ ব্যবস্থার নিরন্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জাতীয় পরিচয়ের ইতিবাচক নবায়ন হয়।

৩. উন্নয়ন সূচনা (Take Off)

উন্নয়নের তৃতীয় ধাপ হল উন্নয়ন সূচনা বা Take off। এই ধাপকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা ধাপও বলা হয়। খুব দ্রুত অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধি হল এই ধাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর অন্যতম কারণ হল চলমান অর্থনীতিতে আধুনিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত চিন্তাধরার বিকাশ। এখানে মানুষের আত্মোপলব্ধি ও স্থায়ী আত্মোন্নয়ন হয়। এই ধাপে চিরায়ত এবং সনাতন চিন্তাধারার অবলুপ্তি ঘটে। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন খাত সম্মৃদ্ধ হয় এবং সনাতন জীবনধারাকে পিছনে ফেলে মানুষ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনধারাকে বরণ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থা একটি স্বাভাবিক গতি পায়, কারণ সনাতন সমাজব্যবস্থায় আমরা যেসব প্রতিবন্ধকতা পেয়েছি তা এই ধাপে দূর হয়ে যায়। শিল্প-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা উন্নত হয়, কৃষিকাজ নির্ভর মানুষের সংখ্যা কমে যায় এবং শিল্পকাজে নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং take off ধাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

- নগরায়ন সম্প্রসারিত হয়, শিল্পায়ন এগিয়ে চলে এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।
- শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং প্রাথমিক খাত (কৃষি খাত) কে পিছনে ফেলে মাধ্যমিক খাত (শিল্প খাত) উন্নয়নের দিকে খুব দ্রুততার সাথে অগ্রসর হয়।
- টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক শিল্প উন্নয়ন সূচনা ধাপে প্রথম সম্মৃদ্ধি পায়, যেমন, গ্রেট বৃটেনের ক্ল্যাসিক শিল্প বিপ্লবে আমরা দেখেছি।

৪. পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা (Drive to Maturity)

উন্নয়ন সূচনা বা Take off ধাপের পর উন্নয়নের চতুর্থ ধাপ হ'ল পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা বা Drive to maturity। এই ধাপে অর্থনীতি বা সমাজের সর্বস্তরে আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার ঘটে। উন্নয়নের এই ধাপ হ'ল সেই সময় যখন সে দেশের সম্পদের সর্বাপেক্ষা ও কার্যকরী ব্যবহারের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। সম্পদ বৃদ্ধি করার কার্যকালাপের জন্য উন্নয়ন এখানে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ীত্ব লাভ করে। এসব কার্যকালাপ বা কর্মকাণ্ড জনকল্যাণমুখী শিল্প উন্নয়নে বিনিয়োগের পথ করে দেয়, যেমন, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ডেইরী সামগ্রী, উন্নত মানের কাপড় ইত্যাদি। এই ধাপের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ'ল এ সময়ে অর্থনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জায়গা করে নেয় এবং পূর্বে যেসব মালামাল বিদেশ থেকে আমদানী করা হত, এখন তা দেশেই উৎপাদিত হয়। এই ধাপটি সূচনা ধাপের একটি উন্নত সংস্করণ। অর্থনীতি শিল্প ও প্রযুক্তির সুক্ষ ও জটিল বিষয়ের প্রতি এই ধাপে গুরুত্ব দেয়। ফলে অর্থনীতি পরিশোধিত ও প্রযুক্তিগতভাবে আরও জটিল প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। সুতরাং Drive to maturity ধাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

- শিল্পের বহুমুখী রূপের বিকাশ ঘটে; নানাবিধ শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে এবং নতুনভাবে উদ্ভাবিত শিল্প খুব দ্রুত স্থায়ী হয়।
- উৎপাদন দ্রুততার সাথে ভোক্তার কাছে পৌঁছায় এবং গার্হস্থ্য কাজে তা ব্যবহৃত হয়।
- পরিবহন অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়ন হয়।
- সামাজিক অবকাঠামো যেমন- স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি খাতে মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করা হয়।

৫. ভোগস্তর (Age of High Mass Consumption)

পঞ্চম ও সর্বশেষ ধাপ হ'ল ভোগস্তর বা Age of High mass consumption। এই ধাপে ভোক্তার সেবার জন্য যেসব মালামাল উৎপাদিত হয় তা স্থায়ী রূপ লাভ করে। অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও ভোক্তার ভোগ উচ্চ মাত্রায় একইভাবে চলতে থাকে। এখানে ভোক্তা পণ্যসামগ্রীর উপর আস্থা রাখে এবং এর উৎপাদন কার্যকারিতার উপর মনোযোগী হয়। প্রিসটন (Priston) বলেন যে, এই স্তরে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, সেইসাথে ভোক্তার ভোগ ও চাকুরী ক্ষেত্রে মানুষের যোগ্যতা ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি এই ধাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়াও যারা অফিস বা শিল্প কারখানায় কাজ করেন তাদের কাজের দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই স্তরে শ্রমিকদের মধ্যে জনকল্যাণমুখী কাজের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

গুসটাভ (Gustuv 1964) বলেন যে, সমাজে অর্থনীতির একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসে বলে প্রযুক্তির আরও সম্প্রসারণ ও ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, ফলে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে অন্যান্য সামাজিক কাজ, যেমন- খেলাধুলা, জনসেবা, সংস্কৃতি চর্চ্চা, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্র সমৃদ্ধশালী হয়। ভোগস্তরে সমাজে দেশের প্রতিরক্ষা, জনকল্যাণ ও উচ্চ শ্রেণির বিলাস বৃদ্ধি পায়। এজন্য প্রত্যেক দেশ তার বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে সচেতন থাকে এবং এ অবস্থাকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। রাষ্ট্রের সর্বত্র সমঅধিকার সম্পন্ন একটি সমাজ গড়ে তোলার আগ্রহ দেখা যায়। এ স্তরে মানুষ দেশের বিশেষত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়, এজন্য সে তার রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের কাঠামো সংরক্ষণে যত্নবান হয়। Age of High mass consumption ধাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

- শিল্পোৎপাদন অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজে ও অর্থনীতিতে প্রাথমিক স্তরের প্রভাব কমে যায়।
- উচ্চ মূল্যের পণ্যসামগ্রী যেমন, গাড়ী, কম্পিউটার, স্মার্ট মোবাইল ফোন ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।
- মানুষ এমনভাবে উপার্জন করে যে, প্রয়োজনীয় ব্যয় ছাড়াও তার উদ্বৃত্ত থাকে প্রচুর, যা দিয়ে সে নানারকম ভোগ ও বিলাসে জীবনযাপন করতে পারে।

রসটোর উন্নয়ন ও শিক্ষা

যে কোন সমাজ ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিকায়নের এই পাঁচটি স্তরের উপর শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। যদি রসটো প্রবর্তিত এই পাঁচটি ধাপের মাধ্যমে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন আনতে হয় তবে শিক্ষাই তার একমাত্র এবং উপযুক্ত মাধ্যম। উদাহরণ হিসেবে প্রথম স্তর সনাতন সমাজব্যবস্থায় সর্বোত্তম উপজীবিকা হিসেবে কৃষির কথাই বলতে হয়। শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেই কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধশালী করা যায়। উন্নত চাষাবাদ প্রক্রিয়া, সেচ পদ্ধতি, উৎপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গড়ে তুলতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার ব্যবহার, উন্নত ও স্বাস্থ্যবান সমাজ গড়ে তোলা ইত্যাদি অনুসরণ শেখার জন্য শিক্ষাই একমাত্র প্রক্রিয়া। শিক্ষাই তাদের উন্নত মানসিক অবস্থা গড়ে তোলে, মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে এবং উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে শেখায়।

দ্বিতীয় ধাপেও শিক্ষাই কার্যকরী হয়। যেমন, এ স্তরে মানুষ তার সমাজে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে সক্ষম হয়, শিল্পে তথা নানারকম মৌলিক উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে শেখে। বৈদেশিক বানিজ্যে আগ্রহ জন্মাতে ও বিনিয়োগ করতে শিক্ষাই তাদেরকে সাহায্য করে। শিক্ষার সাহায্যে মানুষের মধ্যে আধুনিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। যার ফলে সে তার দেশীয় সম্পদ রক্ষাকাজে যত্নবান হয়।

সূচনা স্তরেও শিক্ষা মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব রাখে। শিক্ষার সাহায্যে সে তার সমাজ জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করতে শেখে এবং এ ব্যাপারে সে উৎসাহী হয়। এমন কি উৎপাদন কাজে জনগোষ্ঠির প্রকৃত ও সুষম

ব্যবহার করতে শেখে। শিশুরা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে, যা পরবর্তীতে উন্নত জীবন ধারণে তাদের আকৃষ্ট করে তোলে। সমাজে কাজের গতি বৃদ্ধি করার জন্য এবং নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য শিক্ষা মানুষকে উদ্যোগী করে।

Drive to maturity ধাপে মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ করতে শেখে এবং এগুলো শেখে নানাধরনের কর্মশালা, সেমিনার, সভায় বা শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে। এখানে শিক্ষার সাহায্যে মানুষ সমাজে অধিকার সচেতন হয়। নানাধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে শেখে। যেমন, তারা শেখে যে নারী পুরুষ ভেদে সমাজে সকলের অধিকার সমান এবং সকলে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, সে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। সর্বপরি শিক্ষা মানুষকে তার জ্ঞান ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার উপায় ও উৎসাহ যোগায়।

রসটোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রতিটি সমাজকে তার উন্নয়নে পৌঁছাতে হলে এই ধাপগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন দেশে বা সমাজে এই ধাপগুলোর প্রতিটির ব্যাপ্তি বিভিন্ন রকম, কোন একটি দেশে Take off এর জন্য ৭ বছর লাগলে অন্য দেশে এই সময়কাল ১০ বছর। এসব দেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পেলে সমাজের আধুনিকায়নের জন্য সে অবস্থাকে লালন করে, অর্থাৎ অধিক উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করে। তবে যে কোন অবস্থায় যে কোন দেশের জন্য উন্নয়নের পূর্ব চাহিদা হ'ল শিক্ষা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সনাতন ধাপে সব থেকে বেশি অর্থ ব্যয় হয় কোন খাতে?
ক. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
খ. সেনাব্যবস্থা ও ধর্ম
গ. যুব সমাজের শিক্ষা
ঘ. কৃষি ব্যবস্থা

২. উন্নয়নের স্থায়ীত্ব লাভের সূচনা হয় কোন ধাপে?
ক. Take off
খ. Preconditions for take off
গ. Traditional society
ঘ. Drive to maturity

৩. Take off ধাপে নগরায়ন সম্প্রসারিত হয়, এর কারণ কোনটি?
ক. কৃষি নির্ভরশীলতা কমে যায়
খ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়
গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ হয়
ঘ. শিক্ষার হার বেড়ে যায়।

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আধুনিকায়ন কী? ব্যাখ্যা করুন।
২. Take off এবং Drive to maturity এ দুটি ধাপের মধ্যে পার্থক্য করুন।
৩. ভোগ স্তরে কীভাবে মানুষের আত্মসচেতনতা প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ণনা করুন।
৪. Traditional society ধাপে মানুষ নিম্নস্তরের জীবনযাপন করে- ব্যাখ্যা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করার জন্য রসটো কীভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথকে অগ্রসর করেছেন ব্যাখ্যা করুন।
২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ১.৪ উত্তর আধুনিকায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উত্তর আধুনিকায়নের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উত্তর আধুনিকতা ও আধুনিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- উত্তর আধুনিক সমাজব্যবস্থা চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- উত্তর আধুনিককালে বিভিন্ন শিল্পব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

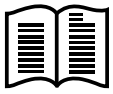

ভূমিকা

অধিকাংশ মানুষ স্বীকার করে যে কোন কিছুই একই রকম থাকে না। অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের পরিবর্তন হয়। গ্রীক দার্শনিকগণ বিশ্বাস করতেন যে সমাজ অবিরত বদলাচ্ছে।হেরাক্লিটাস বলতেন যে সমাজ সবসময়ই পরিবর্তনশীল, প্রত্যেক জিনিস সর্বদা গতিময়তার মধ্য দিয়ে চলছে। দার্শনিক এবং চিন্তাবিদগণ বিশ্বাস করতেন সমাজ নিত্য ও অপরিবর্তনীয় নিয়মে চলছে। চলার একটি শক্তি আছে, যা সমাজকে সামনে চলার গতি যোগায়। আধুনিককালে আমরা সামাজিক বিবর্তন উপলব্ধি করি, যা এক ধরনের উন্নয়ন। আজকের মানব সভ্যতা যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তনের ফসল। এ সভ্যতা আমাদের বসবাসের জন্য পৃথিবীকে জয় করেছে।

আধুনিকতা

সমাজের উন্নয়নমুখী চলনকে আমরা আধুনিকতা বলতে পারি। এ আধুনিকতাকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঐতিহাসিক যুগ বলা যায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই আলোকিত যুগের (The Enlightment) উৎপত্তি হয়। তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা এ ঐতিহাসিক যুগকে চিহ্নিত করা যায়।

- বৌদ্ধিক দিক থেকে সে সময়ে অজ্ঞানতা নয়, যুক্তির শক্তি কার্যকর হত
- বিশৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলার শক্তি বিরাজ করত
- কুসংস্কার নয়, বিজ্ঞানের জয় জয়কার ছিল।

বিশ্বজনীন বহু মূল্যবোধের দ্বারা এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করা হত। বিশ্বাস করা হত বিগত দিনের শাসক শ্রেণির পুরান ধ্যানধারণাকে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে পরাজিত করা যাবে। আধুনিকতা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার (Revolutionary) উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অনেকদিক থেকে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবকে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রকাশ করা যায়। তখন রাজ্য সরকার থেকে ঘোষণা করা হত যে, পুঁজিবাদের আগমন উৎপাদনের এক নতুন কর্মপদ্ধতি এবং পুঁজিবাদ সামাজিক পুরান বিধিনিষেধের রূপান্তরকারী। বিশ্বাসের এই ভিত্তি উন্নয়ন আনতে মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছিল।

স্বর্ণ যুগে দাঁড়িয়ে পিছনে না তাকিয়ে, বর্তমানে যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আলোকিতকরণ (Enlightment) সম্ভব। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে আলোকিতকরণ, যা অসংখ্য সম্ভাবনা ধারণ করে, মানবতার মুক্তি ঘটাতে পারে; এ মুক্তি অজ্ঞানতা থেকে, দারিদ্র থেকে, নিরাপত্তাহীনতা থেকে এবং সন্ত্রাস থেকে মুক্তি।

সাম্প্রতিককালে একটি সাধারণ বিশ্বাস হ'ল সারা পৃথিবীব্যাপী অনেক দুঃখকষ্ট থাকা সত্ত্বেও মানুষের মুক্তির জন্য সকলেই সচেষ্ট। সমাজ যে এগিয়ে চলেছে তা সকলেই বুঝতে পারে। এ চলার একটি শব্দ আছে, তা মসৃণ না; যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ আছে, প্রাকৃতিক ও মানুষকৃত দুর্যোগ আছে, কিন্তু এ সবকিছুই পার হয়ে আমরা সবাই এগিয়ে চলেছি।

বিগত ১৯৭০ সালে ফরাসি বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সমাজ তখন সামনে এবং ঊর্ধে এগিয়ে চলেছে এবং একটি অদৃশ্য শক্তি এ চলনকে তাড়িত করছে। দু'শ বছর পূর্বের সেই আলোকিত আধুনিক যুগে (The Enlightment) আমরা এখনও আছি, বুদ্ধিজীবিরা এ ধারণা বাতিল করে দেন। নতুন এই চিন্তাবিদদের ধারণা অনুযায়ী আধুনিক পৃথিবী শিল্পসংক্রান্ত পুঁজিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার উত্তোরণ ঘটিয়েছে; কিন্তু সেইসাথে এনেছে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা, নাৎসীবাদ ও স্ট্যালিনবাদের আধুনিক ঔপনিবেশিকতার ভয়াবহতা, আন্তর্জাতিক বৈষম্য এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষুধা। যদি এই হয় আধুনিকতার ফসল, তবে তা খুব সুখকর না। Enlightment কী আমাদের এই ধারণা দিয়েছে? তাই যদি হয়, তবে তারা কতদূর চিন্তা করেছিলেন? তাদের এই ভাবনা-চিন্তাগুলো কী খুব বিপদজনক না? তারা মনে করতেন যে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজই আধুনিকতা। এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এ ধারণা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছি। আমরা কী একটি নতুন যুগে প্রবেশ করিনি, যে যুগের নাম দেয়া যায় উত্তর আধুনিক যুগ?

উত্তর আধুনিকায়ন কী?

উত্তর আধুনিকায়নের সংজ্ঞা দেয়ার কাজটি খুব সহজ নয়। অধিকাংশ সংজ্ঞা নৈরাশ্যজনকভাবে অস্পষ্ট এবং একটি সংজ্ঞার সাথে অন্যটির কোন মিল নেই। আধুনিকতা, আধুনিকায়ন, উত্তর আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকায়ন এই শব্দগুলোর মধ্যে যথেষ্ট দ্বন্ধ আছে। আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতা এ দু'টি শব্দের সাথে নান্দনিক ও বৌদ্ধিক অবস্থা এ দু'টি শব্দের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়, যেমন, আমরা স্থাপত্য ও সাহিত্য শব্দ দু'টির মধ্যে পাই। আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতা বলতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বোঝায়, যদিও এটি যথার্থ সংজ্ঞা না। অধিকাংশ বক্তারা বলেন উত্তর আধুনিকতা হ'ল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন।

এর থেকে আরও বেশি জানতে হলে আমাদের স্পষ্ট অর্থের সাথে পরিচিত হতে হবে।

উত্তর আধুনিকতা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একটি সময় বা কাল এবং সেই সময়ে দর্শন, শিল্প, স্থাপত্য ও সমালোচনার প্রশস্ত চলনকে বোঝায়। এ চলনে আধুনিক যুগের সঙ্গে একটি বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নানা রকম ধারণা ও প্রকল্প উত্তর আধুনিকায়নকে ঘিরে রেখেছে, তবুও এর সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয় **উত্তর আধুনিকায়ন হ'ল সেই পদ্ধতি যার সাহায্যে কল্পকাহিনীতে, জাতি বা গোষ্ঠির ভাবাদর্শে এবং অলোকিত যুগের বিভিন্ন মতবাদে যুক্তিসঙ্গতভাবে সংশয় বা সন্দেহ আনা হয়, সেইসাথে লক্ষ্য, বাস্তবতা, সতঃসিদ্ধ সত্য, মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা, উন্নয়ন ইত্যাদিকে অস্বীকার করা হয়।** উত্তর আধুনিকায়ন আমাদের বলে যে জ্ঞান ও সত্য হ'ল সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নিবন্ধ ও ব্যাখ্যা। আধুনিকতা সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক এ তিনদিকের উপর প্রাসঙ্গিকভাবে নির্মিত হয়। একইভাবে বলা যায় উত্তর আধুনিকায়নের বৈশিষ্ট্য হ'ল এটি জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব, নৈতিকতা সম্মন্ধে আপেক্ষিক তত্ত্ব, বহুত্ববাদ, বক্রাঘাত (Irony) ইত্যাদি প্রকাশ করে।

আধুনিক যুগকে অনুসরণ করে যে সময়টি এসেছে এবং যে সময়ে শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন উঠেছে উভয় যুগকে একত্রে উত্তর আধুনিক যুগ বলে আখ্যা দেয়া যায়। আধুনিক যুগে যে সব ধ্যানধারণা প্রচলিত ছিল উত্তর আধুনিক যুগ তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। উত্তর আধুনিকতা সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান, অর্থনীতি, স্থাপত্য, কল্পকাহিনী ও সাহিত্য সমালোচনার সমালোচনাপূর্ণ ব্যাখ্যার প্রতি সংশয়

বা সন্দেহ প্রকাশ করে। উত্তর আধুনিকতা চিন্তণ প্রক্রিয়াকে মূল্য দেয়, যেমন, Deconstruction, Ges Post-Structuralism।

Deconstruction

উত্তর আধুনিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি দার্শনিক তত্ত্ব হ'ল Deconstruction। এই তত্ত্বে বলা হয় কোন লিখিত পাঠ্যাংশের একটি মাত্র অর্থ হতে পারে না, বরং পাঠ্যাংশটি যিনি পড়বেন বা পাঠক নিজেই এর অর্থ তৈরি করবেন।

Post-structuralism

কোন সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ যখন একে অপরকে নির্ণয় করে তখন তার উপর গুরুত্ব দিয়ে Post-structuralism-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়। Deconstruction-এর মত এখানেও নির্ণয় প্রক্রিয়ায় চিন্তন দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

১৮৮০ সালের দিকে উত্তর আধুনিক শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। John Watkins Chapman ফরাসী প্রভাবকে পৃথক করার জন্য 'চিত্রকর্মে উত্তর আধুনিকায়ন' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯১৪ সালে J. M, Thompson ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনায় মানুষের আগ্রহ ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আনার জন্য তার দর্শন শাস্ত্রে উত্তর আধুনিক শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯২১ এবং ১৯২৫ সালে নতুন ধরনের শিল্প ও সঙ্গীতের বর্ণনা দেয়ার জন্য 'উত্তর আধুনিকায়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৪২ সালে H. R. Hays নতুন ধরনের সাহিত্য বিষয়ক ধারণা দেয়ার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করেন।

উত্তর আধুনিকতা এক বৃহৎ আলোড়ন যা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দর্শনশাস্ত্রে ও শিল্পে দৃশ্যমান হয়। নেতিবাচকভাবে এটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে যে এটি হ'ল আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া বা বিপরীত অর্থ। অনেকে আবার বলেন উত্তর আধুনিকতা বৌদ্ধিক চিন্তায় সম্পূর্ণ নতুন একটি নমুনা।

নতুন সময় (New Times)

শিল্প ও দর্শন এ দু'টি ধারার পরবর্তী রূপ হ'ল বর্তমান পৃথিবীব্যাপী কী চলছে, অর্থাৎ তৃতীয় ধারা হ'ল নতুন সময়। আমরা বর্তমানে এই নতুন সময়ে বসবাস করছি। এ নতুন সময়ের ধারণায় বলতে হয় এ সময়টি এসেছে পুরান প্রচুর উৎপাদনে সম্মৃদ্ধ অর্থনীতি থেকে বর্তমান নমনীয় উত্তর সম্মৃদ্ধ সময়। এ সময়ে কম্পিউটার, তথ্য প্রযুক্তি, রোবট ইত্যাদি প্রযুক্তি প্রাধান্য বিস্তার করছে। মার্কসিজমে বলা হয় আমাদের পৃথিবী এখন নতুনরূপে সৃষ্টি হয়েছে। প্রচুর উৎপাদন, প্রচুর ভোগ, বৃহৎ নগর, বড়ভাই সুলভ রাষ্ট্র, প্রশস্ত গৃহ বিন্যাস এসব কিছুকে এখন অস্বীকার করা হয়। নমনীয়তা, বৈচিত্র্যতা, পৃথকীকরণ, যোগাযোগ, গতিময়তা, বিকেন্দ্রীকরণ, আন্তর্জাতিকরণ ইত্যাদি এখন প্রভাব বিস্তার করছে। আমাদের নিজেদের পরিচয়ে আত্মবোধ, আত্মনিষ্ঠতা এসব বদলে গেছে। আমরা এখন নতুন সময়ের ক্রান্তিকালে বসবাস করছি।

অনেকে মনে করেন আমরা এখন কয়েক বছর পূর্বের তুলনায় এক ভিন্ন ধরনের সমাজে বাস করছি। আসুন আমরা দেখি সে সমাজটি কেমন বা কী প্রকার সে সমাজ।

উত্তর শিল্প সমাজ (Post Industrial Society)

Daniel Bell বলছেন কৃষিভিত্তিক সনাতন সমাজ থেকে আমরা শিল্পভিত্তিক সমাজে অনেক আগেই সরে এসেছি। বর্তমানে আধুনিক শিল্পসম্পদ উৎপাদনভিত্তিক সমাজ থেকে আমরা উত্তর শিল্প সমাজে প্রবেশ করেছি, যেখানে সেবামূলক অর্থনীতির (Service Economy) সাহায্যে বস্তু উৎপাদন হয়। Daniel Bell-এর বর্ণনা অনুযায়ী

উত্তর শিল্প সমাজে প্রবেশ করাতে আমাদের জীবনে একটি সামাজিক পরিবর্তন এসেছে। এ সমাজকে 'জ্ঞানভিত্তিক সমাজ' বলা যায়, যা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও কৌশলী অভিজাত সম্প্রদায় দ্বারা চালিত। অন্যদিকে আমরা এর পূর্বে ছিলাম শিল্প সমাজে, যা শিল্পপতি ও নিয়োগকর্তা দ্বারা পরিচালিত ছিল।

উত্তর পুঁজিবাদ (Post Capitalism)

আজকের মার্কসিজম অনুযায়ী সমসাময়িক পুঁজিবাদ তার প্রচলিত বৈশিষ্ট্য থেকে সরে এসেছে। আগে ছিল প্রচুর উৎপাদন, উৎপাদনের একটি আদর্শ বৈশিষ্ট্য, কোন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার এবং শ্রমিকদের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। প্রচুর উৎপাদন যেমন ছিল প্রচুর ভোগও তেমন ছিল। এর জন্য বেশি পরিমান বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হত এবং জাতীয় বাজারকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হত যেন চাহিদা নিম্নমুখী না হয়। এ অবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বহুদিন পর্যন্ত চলে এসেছে।

১৯৬০ সালে শেষ দিক এবং ১৯৭০ সালের প্রথম দিক থেকে একটি নতুন পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছে। কম্পিউটারের অনুপ্রবেশ খুচরো বিক্রেতাদের বহুল পরিমানে গুদামজাত করা থেকে বিরত করে সরবরাহ প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে। উচ্চ বাজারকে নির্দিষ্ট লক্ষদলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছে। নির্দিষ্ট ভোগদলকে লক্ষ্য করার অর্থ হ'ল বিক্রয় পরিকল্পনা সুনির্দিষ্টকরণ, যেন উৎপাদনের অপচয় না হয়।

অসংগঠিত পুঁজিবাদ (Disorganised Capitalism)

পশ্চিমা দেশগুলো এখন সংগঠিত পুঁজিবাদ থেকে অসংগঠিত পুঁজিবাদে চলে এসেছে। অসংগঠিত পুঁজিবাদ বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় ধরে চলমান। এর বৈশিষ্ট্য হ'ল-

- পুঁজির ঘনত্ব বৃদ্ধি এবং মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বিচ্ছিন্ন
- পেশাজীবি, ব্যবস্থাপক ও প্রশাসক পেশার জন্ম
- ব্যবসা ও ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতায় রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয় অর্থনীতি পরিচালিত হয়
- উদ্ভাবন শিল্পের প্রভাব
- জাতীয় আবস্থার উন্নয়ন।

উপরের সব বৈশিষ্ট্যগুলো অসংগঠিত পুঁজিবাদে প্রতিফলিত হয়। এখানে এক সংস্কৃতিবদ্ধ জাতী খন্ডিত হয়ে বহু ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

উত্তর আধুনিককালে বিভিন্ন শিল্প ব্যবস্থা

শিল্প

উত্তর আধুনিক শিল্প বলতে শুধুই চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্য বোঝায় না, বরং স্থাপত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদিও বোঝায়। শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এর কোন গভীরতা এবং সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ নেই। এর আকার-আকৃতি এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। শিল্প সমালোচক Suzy Gablik এক বক্তৃতায় উত্তর আধুনিকতার বহুমাত্রিক ও নীতি বিবর্জিত প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলছেন এখানে যে কোন বিষয়ের সাথে যে কোন বিষয় চলতে পারে, অনেকটা কোন নিয়মকানুন ছাড়া যে খেলা, তার মত। যেন ভাসমান প্রতিকৃতি, কোন কিছুর সাথেই ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখে না এমন।

দর্শন

উত্তর আধুনিকতার পরবর্তী ধারা হ'ল দার্শনিক বা দর্শন। ১৯৬০ সালে যখন পশ্চিমা ইউরোপের সাথে যুক্ত রাষ্ট্রের হাঙ্গামা ছিল, তখনকার দিনের প্রভাবে ১৯৭০ *সালে* একদল ফরাসী দার্শনিক মোহবিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে খুব অল্প সময়ের জন্য পশ্চিমা দেশেগুলোর ছাত্র সংগ্রাম, ট্রেড ইউনিয়ন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদী, সাম্যবাদী, জঙ্গী সমাজতন্ত্রবাদীর কর্মক্রিয়ায় ঐসব দেশে এক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি। ফ্রান্সে এই সংগ্রাম খুব তীব্র ছিল। সাম্যবাদী দল দ্বারা এ পরিবর্তনের অধিকারী হওয়ার এক অস্পষ্ট বিশাল প্রভাব ছিল। দার্শনিকদের মোহবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হ'ল তারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এবং প্রধান কোন তত্ত্ব যেমন, মার্কসিজম এর উপর তাদের কোন বিশ্বাস ছিল না। এ ব্যাপারে তারা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এর প্রকৃত সামাজিক জীবন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে তারা ব্যর্থ হন। তারা এ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করেছিলেন কিন্তু সমসাময়িক শিল্পীদের দেয়া বিষয়বস্তুর ফাঁক দিয়ে তা বেরিয়ে আসে। তাদের মতানৈক্য সত্বেও তারা বাস্তবতার খন্ডিত এবং বহুজাতিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। বাস্তবতার ব্যাখ্যায় মানুষ যে কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম এ চিন্তনকে তারা অস্বীকার করেছিলেন। মানুষ তার নিজ চেষ্টায় উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে এ ধরনের সামাজিক তত্ত্বকে তারা অর্থহীন বলেছিলেন। মানুষের কর্মকুশলতার উপর তাদের কোন বিশ্বাস ছিল না, তা সে মার্কসিজম, উদারপন্থী বা ফ্যাসীজম যাই হোক না কেন। ধ্রুব সত্য বলে কিছু নেই। অতীতে তারা যা করেছিলেন তা আইনসঙ্গত। তারা তাদের ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন যারা জানে কিন্তু যারা জানে না তাদের ক্ষমতা অস্বীকার করতেন।

স্থাপত্য

স্থাপত্য শিল্পে উত্তর আধুনিকায়নের ধারণা শুরু হয়েছে উপলব্ধিজাত নম্রতার (Perceived Blandness) সাড়া প্রদানের মাধ্যমে এবং আধুনিক যুগের নিখুঁত বা সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ব্যর্থতায়। আধুনিক স্থাপত্য বিষয়বস্তুর উৎকৃষ্ট রূপের উপলব্ধিকে অনুসরণ করে এবং আকারআকৃতি ও কাজে সাদৃশ্য রাখার জন্য চেষ্টা করে। সে যুগের স্থাপত্য অহেতুক অলঙ্করণকে উপেক্ষা করে। খাঁটি উত্তর আধুনিক স্থাপত্য প্রকৃত আকার-আকৃতি অথবা যথার্থ স্থাপত্য বিষয়ক ধারণাসমূহকে বাতিল করে দেয়, বিনিময়ে স্থপতির সাধ্য অনুযায়ী যত পদ্ধতি, আকার, উপাদান ও রং পাওয়া যায় তার মধ্যে দর্শনীয় অঙ্কনগুলো ব্যবহার করে।

উত্তর আধুনিক স্থাপত্য হ'ল প্রথম নান্দনিক অবস্থা যা আধুনিকতার সাথে খোলাখুলিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আসতে পারে। কারণ আধুনিকতা হ'ল অপ্রচলিত, সেকেলে এবং নিজের প্রাধান্যকেই মূল্য দেয়।

সঙ্গীত

উত্তর আধুনিক সঙ্গীত হ'ল উত্তর আধুনিককালের সঙ্গীত বা উত্তর আধুনিকতার নান্দনিক ও দার্শনিক বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করে যে সঙ্গীত। উত্তর আধুনিকতার ক্ষেত্রে সঙ্গীত কিছু অংশে আধুনিকতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে উত্তর আধুনিক সঙ্গীতকে আধুনিক সঙ্গীতের একেবারে বিপরীত হিসেবে ধরা হয়। সেজন্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে হয় সেটি আধুনিক, নয়তো উত্তর আধুনিক, উভয় প্রকার কখনওই না।

উত্তর আধুনিক ধ্রুপদ সঙ্গীত সাধারণ সঙ্গীতের রীতি অনুসরণ করে না, বরং সে সঙ্গীতে উত্তর আধুনিককালের বিষেশত্ব আছে। উত্তর আধুনিককালের সঙ্গীত উত্তর আধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এ বৈশিষ্ট্য আধুনিকতার পরবর্তী এবং বিপক্ষে অবস্থান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিশ্বাসের কোন ভিত্তি উন্নয়ন আনতে মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছিল?
ক. কুসংস্কার না, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
খ. আমরা এখন আলোকিত যুগে নেই
গ. পুঁজিবাদ উন্নয়নের নতুন কর্মপদ্ধতি
ঘ. সত্য হ'ল ঐতিহাসিক নিবন্ধ বা ব্যাখ্যা

২. অধিকাংশ বক্তারা বলেন উত্তর আধুনিকতা হ'ল-
ক. সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন
খ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন
গ. অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন
ঘ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন

৩. কোনটি উত্তর আধুনিকায়নের বৈশিষ্ট্য?
ক. সঙ্গীত আধুনিকালের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত
খ. শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান
গ. স্থাপত্য অলঙ্করণকে উপেক্ষা করে
ঘ. মানুষ ধ্রুব সত্য দ্বারা পরিচালিত হয়।

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উত্তর আধুনিকায়ন কী বুঝিয়ে লিখুন।
২. উত্তর আধুনিকায়ন দার্শনিক ধারায় কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে?
৩. আধুনিক যুগের সাথে উত্তর আধুনিক যুগের পার্থক্য কী?
৪. আলোকিত আধুনিক যুগে আমরা এখনও আছি, বুদ্ধিজীবিরা এ ধারণা বাতিল করেন কেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উত্তর আধুনিককালের নতুন সময়ে আমরা কিরূপ সমাজে বসবাস করছি সে সম্পর্কে আপনার মতের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।
২. তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়ন উত্তর আধুনিকতার প্রভাবে কিরূপ আকার ধারণ করেছে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ১.৫: উন্নয়নের নির্ভরশীলতা তত্ত্ব/মার্কসের দর্শন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নির্ভরশীলতা তত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মার্কসের উন্নয়ন তত্ত্ব লিখতে পারবেন এবং
- আধুনিক মার্কসিষ্ট নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency Theory) কোন একটি সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরীণ পারস্পারিক সম্পর্ক এবং ঐ সমাজের সাথে অন্য সমাজের ঐসব বিষয়াবলীর পারস্পারিক সম্পর্কের প্রতি আলোকপাত করে। কোন সমাজের বা অঞ্চলের অনুন্নয়নকে অন্য একটি সমাজের বা অঞ্চলের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বলে মনে করা হয়। নির্ভরশীল শব্দটি ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে অনুন্নত দেশসমূহ যার অধিকাংশই ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠির কুক্ষিগত ছিল, তারা শাসক দেশের উন্নয়নের রসদ যুগিয়ে এসেছে। ফলে স্বাধীনতাত্তোর উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নের জন্য তারা ঐতিহাসিকভাবে পূর্বের শাসক দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব অনুযায়ী সম্পদের পাচার হতে পারে নানাভাবে–

- একেবারে সরাসরি লুণ্ঠন করে
- সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের মাধ্যমে
- বর্তমান কালের বহুজাতিক কোম্পনিগুলোর মাধ্যমে।

এই তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবীকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।
এক. ধনী বা উন্নত দেশসমূহ।
দুই. উন্নয়নশীল দেশসমূহ।

আমরা জানি দ্বিতীয় শ্রেণির দেশগুলো প্রথম শ্রেণির দেশগুলোর উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। সে কারণে ঔপনিবেশের যুগ শেষ হলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পরোক্ষভাবে সম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের আধিপত্য ও শোষণ অব্যাহত রয়েছে। এই প্রক্রিয়া টিকিয়ে রাখার জন্য কোন দেশকে বাস্তবে অধিকারে রাখার প্রয়োজন হয় না। দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের নেতৃবৃন্দ ও অভিজনেরা ধনতন্ত্রবাদী বা ধনী দেশসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও

স্বার্থকেন্দ্রিক মনোভাব পোষণ করলেই হয়। এদের নামকরণ করা হয়েছে লুম্পেন বুর্জোয়া (Lumpen Bourgeoisie)। এরাই প্রভূদের স্বার্থ রক্ষা করে।

নির্ভরশীলতার সংজ্ঞা (Definition of Dependency)

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের তাত্ত্বিকদের মধ্যে নানাধরনের মতপার্থক্য আছে। সে কারণে নির্ভরশীলতার একাধিক তত্ত্ব বিদ্যমান। অধিকাংশ তত্ত্বের মধ্যে কিছু মৌলিক উক্তি নিহিত আছে।

জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার উপর রাজনীতি, অর্থ ও সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাখ্যাকে নির্ভরশীলতা বলে। Theotonio Dos Santos তার সংজ্ঞায় নির্ভরশীলতার ঐতিহাসিক মাত্রার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলছেন, নির্ভরশীলতা হ'ল একটি ঐতিহাসিক অবস্থা, যা পৃথিবীর অর্থনীতিকে একটি নির্দিষ্ট আকার প্রদান করে। এ সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, নির্ভরশীলতা অর্থ কোন পরিস্থিতি যা কোন দেশকে অন্য দেশের ক্ষতি করতে সমর্থন যোগায় এবং নির্ভরশীল দেশটির উন্নয়নের সম্ভাবনা হ্রাস করে। ফলে পূর্বের দেশটির অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটে।

এসব সংজ্ঞায় তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

১. নির্ভরশীলতা দুই ধরনের রাষ্ট্রের সমন্বয়ে প্রকাশ করা যায়, এক. প্রভাবশালী ও নির্ভরশীল, অথবা কেন্দ্রীয় ও পার্শ্বীয়। প্রভাবশালী রাষ্ট্র হ'ল সেই সব দেশ যারা অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংগঠন (OECD) অন্তর্ভুক্ত উন্নত ও অগ্রসর জাতি। অন্যদিকে নির্ভরশীল দেশ হ'ল যারা প্রধানত ল্যাটিন অ্যামেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র। এসব দেশের বৈশিষ্ট্য হ'ল নিম্ন মাথা পিছু আয় ও এরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য নিজ দেশের কোন একটি বা দুটি পণ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে।
২. দুটি সংজ্ঞাতেই একটি সাধারণ ধারণা হ'ল, নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রতি বাহ্যিক শক্তির গুরুত্ব খুব কম। এই বাহ্যিক শক্তি হ'ল বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ, আন্তর্জাতিক পণ্য বাজার, বিদেশী সাহায্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। এর সাহায্যে উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক আগ্রহ বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে।
৩. নির্ভরশীলতার সব রকম সংজ্ঞাতেই বলা হয় যে প্রভাবশালী ও নির্ভরশীল দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক খুব গতিময়। কারণ এই দুই ধরনের রাষ্ট্রের মধ্যে যে আন্তক্রিয়া তা শুধুই শক্তি পূণর্গঠনের জন্য না বরং তাদের অসম আদর্শের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। এছাড়াও নির্ভরশীলতা অনেক গভীর বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। এর শেকড় পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিকতার মধ্যে গ্রথিত। নির্ভরশীলতা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

সংক্ষেপে বলা যায় নির্ভরশীলতা তত্ত্ব পৃথবীর বিভিন্ন অনুন্নত দেশের আন্তক্রিয়ার যে অসম প্রকৃতি তা ব্যাখ্যা করে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মূলকথা

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব সম্পর্কে একাধিক উক্তি আছে, এসব উক্তি পারস্পারিক তর্কসাপেক্ষ। তবে এগুলোই তত্ত্বের মূল কথা।

১. বস্তুগতভাবে নিম্ন উন্নয়ন আর অনুন্নয়ন এক না। অনুন্নয়ন হ'ল সেইসব রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য যারা তাদের সম্পদ ঠিকমত ব্যবহার করে না। উদাহরণ হিসেবে উত্তর আমেরিকার অনুন্নত এলাকাকে ধরা যায়। এখানে ভূমি

ঠিকমত চাষ করা হয় না। নিম্ন উন্নয়ন সেই সব দেশের বৈশিষ্ট্য যেখানে তাদের সম্পদ যথার্থই ব্যবহার করা হয়, তবে এমনভাবে যে তাতে প্রভাবশালী দেশগুলো উপকৃত হয়। সম্পদ যাদের তাদের কোন লাভ নেই।

২. ঐতিহাসিকভাবে নিম্নউন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের পার্থক্য পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে গভীর পার্থক্য তৈরি করে। এই দেশগুলো পৃথিবীর ধনী দেশগুলো থেকে অনেক পিছিয়ে অছে। তারা দরিদ্র নয় এ কারণে যে তারা বৈজ্ঞানিক রূপান্তরের অথবা ইউরোপিয়ন দেশের আলোকিত মূল্যবোধের পিছনে চলে, এবং তারা দরিদ্র এ কারণে যে তারা হ'ল ইউরোপিয়ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার কাঁচামাল উৎপাদনকারী অথবা বলা যায় তারা হচ্ছে স্বল্প মূল্যের শ্রমের ভান্ডার। তারা প্রভাবশালী রাষ্ট্রের সাথে প্রতিযোগিতা করে দেশীয় সম্পদের বাজার তৈরি করতে ব্যর্থ হয়।

৩. নির্ভরশীলতা তত্ত্ব অনুযায়ী উন্নত বিশ্বের চাপিয়ে দেয়া ব্যবহার থেকে দেশীয় সম্পদের দেশের ভিতরে অন্য কোন উপায়ে ব্যবহার করা উত্তম। এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কোন উপায় বলা হয়নি কবে কোন না কোন উপায় তো পাওয়া যাবেই। নির্ভরশীলতা তাত্ত্বিকেরা বিদ্রুপ করে বলেন যে একটা উদাহরণ হ'ল প্রভাবশালী দেশে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী। এখানে বিদ্রুপাত্মক বিষয় হ'ল অনেক দরিদ্র অর্থনীতি আছে যারা উচ্চমাত্রার অপুষ্টিতে ভুগছেন, কিন্তু তারা রপ্তানীর জন্য বিপুল পরিমান শষ্য উৎপাদন করছেন। এইসব নির্ভরশীলতা তাত্ত্বিকের মতে এদের অপুষ্টি হ্রাস করার জন্য অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪. নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক দেশের নিজেদের একটি স্পষ্ট জাতীয় অর্থনীতি আছে। এক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে। সরকারকে তুষ্ট করার চেয়ে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির চাহিদা মেটানো গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দরিদ্র মানুষের কিসে ভাল হবে তা বের করা বেশ কঠিন। নির্ভরশীলতা তাত্ত্বিকরা জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে কোন কার্যকরী প্রস্তাব এখনও দিতে পারেননি।

৫. অনেক দিন ধরে সম্পদের এই শোষণ (মনে রাখা উচিত যে পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্প্রসারণ যখন শুরু হয় তখন থেকে নির্ভরশীলতার সম্পর্কটি জোর করে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল) শুধুই প্রভাবশালী রাষ্ট্রের শক্তি দ্বারা চলছে তা নয়, তাদের নিজ সমাজের ক্ষমতাবানদের দ্বারাও শোষণ চলে। সমাজের প্রভাবশালী বা ক্ষমতাবানরা উন্নত দেশের সাথে সদ্ভাব রেখে চলে, কারণ তাদের আগ্রহ আর উন্নত দেশের আগ্রহ বা প্রবণতা একই সূত্রে গাঁথা। তাদের স্বার্থ একই, উদ্দেশ্য একই, মূল্যবোধও এক। সুতরাং নির্ভরশীলতার সম্পর্ক এক ধরনের 'সেচ্ছাপ্রণোদিত' সম্পর্ক। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষমতাবানরা যে ইচ্ছা করে দরিদ্রের স্বার্থ পরিপন্থি কাজ করে তা না; তারা বিশ্বাস করে উদার অর্থনৈতিক মতামতকে অনুসরণ করলেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে। অর্থাৎ উন্নত দেশের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে, এটাই তারা বিশ্বাস করে।

মার্কসের উন্নয়ন তত্ত্ব (Marxist Theories of Development)

ইউরোপীয় সমাজ বিশারদদের মধ্যে হেগেল সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি সমাজ পরিবর্তনে দ্বন্দ্বকে প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনায় আনেন। তার দ্বান্ধিক নীতিমালায় সকল পরিবর্তনকে একটি প্রক্রিয়ার থিসিস (Thesis), এন্টিথিসিস (Abtithesis) ও সিনথেসিস (Synthesis)-এর ফল হিসেবে দেখা হ'ত। এই মতবাদ মার্কসের সমাজ পরিবর্তনের মূলভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয় এবং পরবর্তীকালে উন্নয়ন তত্ত্বের একটি ধারা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মার্কসের মতে সমাজ পরিবর্তনের মূল ঘটক হচ্ছে অর্থনৈতিক কাঠামো। শ্রেণিভিত্তিক সমাজ বলতে

বোঝায় ঐ সমাজ যেখানে উৎপাদনের উপায় ব্যক্তিমালিকানার নিয়ন্ত্রণে থাকে। অন্যদিকে শ্রেণিহীন সমাজ বলতে বোঝায় যেখনে উৎপাদনের উপায় সমষ্টির হস্তগত বা যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত। মার্কস প্রথম ধরনের সমাজকে বুর্জোয়া সমাজ (Bourgeois Class) এবং দ্বিতীয় ধরনের সমাজকে সর্বহারা সমাজ (Proletariat Class) বলে আখ্যায়িত করেন। তার মতে পুঁজিবাদ ব্যবস্থা মালিক কর্তৃক প্রলেতারিয়া বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের শ্রমের উদ্বৃত্ত মুনাফা জোর করে আদায়ের উপর নির্ভরশীল। শ্রমিক শ্রেণি এই শোষণ সম্পর্কে সচেতন না। মার্কস মনে করতেন শ্রমিক শ্রেণি এই শোষণ সম্বন্ধে যখন সচেতন হবে তখন শ্রেণি দ্বন্দ্ব শুরু হবে। ফলশ্রুতি হিসেবে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের কাঠামোগত বিরাট পরিবর্তন হবে এবং শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সমাজ ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। মার্কস এই অবশ্যম্ভাবী ক্রান্তিকালকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখতেন। বলা হত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন একটু ভিন্নভাবে আসবে। মার্কস সমাজতন্ত্রকে পুঁজিবাদ ও কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যবর্তী পর্যায় বলে মনে করতেন। মার্কসের উন্নয়ন কার্যক্রমের দু'টি প্রধান কর্মসূচি হ'ল, গণশিক্ষা এবং ভাবাদর্শ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। এর মাধ্যমে প্রলেতারিয়া তার শোষণের অবস্থা সম্মন্ধে সজাগ হবে। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে মার্কসের চিন্তাধারা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট মতবাদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। মার্কস ইতিহাসের যাত্রাপথকে একমুখী বিবর্তন প্রক্রিয়া বলে গণ্য করতেন। আদিম সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ হয়ে শেষাবধি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে উত্তরণ।

ক্ল্যাসিকাল আধুনিক মার্কসিষ্ট নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Classical Neo-Marxist Dependency Theory)

Paul Baran এবং Andre Gunder Frank তৃতীয় বিশ্বের নিম্ন উন্নয়ন ও নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেন।

Baran যুক্তি দেখান যে দ্বৈত অর্থনীতি পশ্চাদমুখী দেশগুলোর বৈশিষ্ট্য। একটি হ'ল বৃহৎ কৃষি খাত এবং অন্যটি হ'ল ক্ষুদ্র শিল্প খাত। কৃষি উৎপাদন থেকে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের সম্ভাবনা এবং লাভের আশা যৎসামান্য। অথচ তৃতীয় বিশ্বের ১.৪ বিলিয়ন কৃষক যা উৎপাদন করে তা বিশ্ব বাণিজ্যের ১৩% এরও কম (Keet, ২০০২)। Baran শ্রেণিগত সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত ভোগে কৃষকদের মধ্যে পারস্পারিক সংঘর্ষের উপর জোর দেন। ক্ষমতার বিন্যাস উন্নয়নের প্রাথমিক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই দেখা যায় তৃতীয় বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বিষয়ই অনুন্নয়নের প্রধান কারণ। তিনি বলেন নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শিল্পোন্নয়ন ঘটানোর জন্য বড় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। Baran এর বিরোধিতা করে Frank বলেন অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত উদ্ধার করার গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হ'ল বানিজ্য এবং পণ্যদ্রব্য ও সেবা বিনিময় করা। এ বিনিময় আন্তর্জাতিকভাবে হতে পারে অথবা অভ্যন্তরীণভাবে, নির্ভরশীল দেশের মধ্যে। তিনি নির্ভরশীলতা সমস্যার সমাধান হিসেবে বলেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে বিশ্ব বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তারা উন্নত হবে। এখানে প্রত্যক্ষভাবে বাহ্যিক কারণ যেমন, ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসকে দোষারোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে তিনি বলেন অনুন্নয়নের কারণসমূহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভ্যন্তরে নিহীত। কারণগুলো হ'ল তাদের সংস্কৃতি, জনসংখ্যা স্ফীতি, স্বল্প বিনিয়োগ বা জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন গঠনমূলক কাজের প্রতি জনসাধারনের আগ্রহ ও চেতনার অভাব।

সমীর আমেন বলছেন প্রভাবশালী দেশগুলো উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তারা নিজেদের উপর আস্থা রাখতে পারে। অন্যদিকে নির্ভরশীল দেশগুলো যে উৎপাদন করে তার উদ্বৃত্ত তারা নিজেরা ভোগ না করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের

জন্য রপ্তানী করে। এমন কি উদ্বৃত্ত দিয়ে তারা নিজ অঞ্চলের কোন উন্নয়নও করে না। এ ধরনের রপ্তানী প্রক্রিয়ায় তারা শোষিত হয়, অর্থাৎ তারা ন্যায্যমূল্য পায় না। আমেন বলেন এর পরিবর্তে তারা তাদের উর্বর ভূমিতে নিজেদের জন্য ফসল উৎপাদন করতে পারে। এমানুয়েলের তত্ত্ব অনুযায়ী উন্নত দেশে পণ্য রপ্তানী ও অনুন্নত দেশের নির্ভরশীলতা, এ দু'টি বিষয়ই উন্নত এবং নির্ভরশীল দেশের মধ্যে অসম পণ্য বিনিময়ের কারণে ঘটে। তিনি দেখেছেন এই দুই ক্ষেত্রে একই কাজে শ্রমিকদের দু'ভাবে পারিশ্রমিক দেয়া হয়। কৃষি উৎপাদন রপ্তানী করা হয়, সেখানে অনেক বেশি শ্রম ব্যয় হয়। আর নির্ভরশীল দেশে উন্নত দেশ থেকে নানাধরনের যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তিগত ধারণা, পদ্ধতি ও যন্ত্র ইত্যাদি আমদানী করা হয়। ফলে উভয় ধরনের দেশের মধ্যে যে বিনিময় ঘটে তা অসম প্রকৃতির। এসব তত্ত্ব তৃতীয় বিশ্বের দৃষ্টিকোন থেকে নিম্ন উন্নয়ন ও নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করেছে। অধিকাংশ তত্ত্ব পশ্চাদপদ অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বাহ্যিক কারণসমূহকে চিহ্নিত করেছে। ভাবুন, এই অসম বিনিময় অন্য দেশ থেকে চাপিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের বিপরীত তাত্ত্বিক গঠন হ'ল কেন্দ্রিয় দেশ বনাম পার্শ্বিয় দেশ। এ সমস্যার যে সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছে তা হ'ল একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক এই প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে একে বিচ্ছিন্ন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. লুমপেন বুর্জোয়া কারা?
ক. উন্নত দেশের শাসকগোষ্ঠি
খ. উন্নত দেশের সর্বসাধারণ
গ. নিজ গোত্রের প্রতিনিধি
ঘ. নিজ সমাজের প্রভাবশালীরা

২. মার্কসের মতে কোনটি সমাজ পরিবর্তনের মূল ঘটক?
ক. জনসাধারণের আগ্রহ
খ. অর্থনৈতিক কাঠামো
গ. সামাজিক কাঠামো
ঘ. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

৩. Frank-এর মতে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের কারণ নিহীত কোথায়?
ক. উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিতে
খ. সমাজের ক্ষমতাবানদের ইচ্ছায়
গ. নিজ দেশের অভ্যন্তরে
ঘ. ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে।

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নির্ভরশীলতা তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা করুন।
২. মার্কসের উন্নয়ন তত্ত্ব আলোচনা করুন।
৩. উদার অর্থনৈতিক মতামতকে অনুসরণ করলেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে- এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন।
৪. নির্ভরশীলতা তত্ত্বের সংজ্ঞার তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মার্কসিষ্ট নির্ভরশীলতা তত্ত্বের আধুনিক স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।
২. মার্কসের ভাষায় উন্নত দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন। এর উত্থান কীরূপে সম্ভব আলোচনা করুন।

পাঠ ১.৬: টেকসই উন্নয়ন ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- টেকসই উন্নয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাবের ইতিহাস বলতে পারবেন;
- টেকসই উন্নয়ন ও শিক্ষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে কোন ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

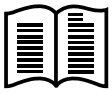

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীল শক্তির বৃদ্ধি এবং বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানের উৎকর্ষ সাধন। পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও সমাজকে পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং পরিবেশের যত্ন নিতে হবে। কেননা জনগণের কার্যক্রমে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

পরিবেশের বিপর্যয় অথবা প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিমিত ক্ষয় নতুন কোন বিষয় না। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই এর সূত্রপাত। এটির তীব্রতা লাভ করেছে শিল্পবিপ্লব ও শিল্পায়ন, নগরায়ন, প্রযুক্তি বিপ্লব, সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং পাশ্চাত্যেও ভোগসর্বস্ব ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের দারিদ্র্যপীড়িত অর্থনীতির কারণে। ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে মানুষের জীবনের উপর ভৌত পরিবেশের পরিবর্তনগত প্রভাব নিয়ে প্রথম কার্যকর চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। কিন্তু তা কেবল গবেষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

১৯৭২ সালে ডনেরা মিডোজ ও ডেনিস মিডোজ প্রণীত The Limits to Growth গ্রন্থ প্রকাশিত হলে বিশ্বব্যাপী তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। গবেষণাধর্মী এই গ্রন্থে তারা বলেন, "পৃথিবীর সম্পদরাশি ও সম্পদের উৎস যেমন সীমাবদ্ধ, তেমন তার দূষণ সহ্য করার ক্ষমতাও অসীম না"। ১৯৭২ সালের জুন মাসে স্টকহোম এ অনুষ্ঠিত হয় United Nations Conference on the Human Environment শীর্ষক সম্মেলন। ঐ সম্মেলনে পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসাত্মক ব্যবহারের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি নিয়ে আলোচনা হয়। ঐ সম্মেলনের মাধ্যমে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় অঞ্চলে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

১৯৮০ সালে 'Living Resouce Conservation for Sustainable Development' শীর্ষক রিপোর্টে টেকসই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে "Sustainable development means improving the quality of human life while living within the carrying capacity of the supporting ecosystems". তবে এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার ও বনজ সম্পদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। একটি প্রকৃত বর্ণনায় টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future

generations to meet their own needs" (World Commission on Environment and Development, 1987). এ ধারণাটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

টেকসই উন্নয়নে তিনটি উপাদান থাকবে, যথা–

- পরিবেশ
- সমাজ
- অর্থনীতি

এই তিনটি ক্ষেত্র পরস্পর অভিন্ন, পৃথক না। যেমন, একটি স্বাস্থ্যকর, সমৃদ্ধশালী সমাজ তার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে খাদ্য, সম্পদ, বিশুদ্ধ জল ও বিশুদ্ধ বায়ু পরিবেশনের জন্য সব সময়ই স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপর নির্ভর করে। যদি আপনি এই তিন ক্ষেত্রকে একই মাপের বৃত্ত মনে করেন যা একে অপরকে আবৃত্ত (Overlap) করে আছে, তবে আবৃত্তের কেন্দ্রে থাকবে মানুষের সুঅবস্থা। পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতি এ তিন বিষয়কে যত সারিবদ্ধ করা হবে আবৃত্তের ক্ষেত্র তত বৃদ্ধি পাবে, মানুষের অবস্থাও তত উন্নত হবে।

আমরা মনে করি টেকসই উন্নয়ন হ'ল ব্যবসা করার জন্য নতুন কৌশল ও নতুন উপায়, যা পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে আমাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করবে। এর ফলে আগামী প্রজন্মের কোন ক্ষতি হবে না বরং তারা কমপক্ষে আমাদের মত সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবনযাপন করতে পারবে।

মানবাধিকার সংস্থা বলছে, শান্তি, ন্যায় বিচার ও গণতন্ত্রের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন আনা সহজ হয়।

১৯৯২ সালে ব্রজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit)। সারা বিশ্বে উন্নয়ন ও পরিবেশ প্রশ্নে এটি একটি মাইল ফলক। এ সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ১৭০টি দেশের সরকার প্রধান ও উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এখানে পরিবেশত অবনতিকে বিপরীতমুখীকরণ এবং পরিবেশগতভাবে সহনীয় ও টেকসই উন্নয়নকে তরান্বিত করার জন্য অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এর উপযোগী কর্মসূচি ও কৌশল প্রণয়নের তাগিদ দেয়া হয়।

টেকসই উন্নয়ন ধারণাটি এখন শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান প্রজন্মের ভোগ সীমিতকরণকেই বোঝায় না, বরং এটি নির্দেশ করে, সংখ্যালঘিষ্টের অ-টেকসই ভোগের কারণে বর্তমান প্রজন্মের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়া যেন বাধাগ্রস্থ না হয় সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন শুধুমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণের তাগিদই প্রদান করে না, বরং এটি এক নতুন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ইংগিত করে। এই প্রবৃদ্ধি বিশ্বের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিসাধন না করে এবং বিশ্বের ধারণযোগ্য ক্ষমতার সঙ্গে আপোস না করে বিশ্বের গুটিকয়েক সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠির পরিবর্তে সব মানুষের জন্য সুবিধা সৃষ্টির অঙ্গীকার করে।

ইউএনডিপি রিপোর্ট ১৯৯২ এ টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য ন্যূনতম যে প্রয়োজনীয়তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে তা হ'ল–

- দারিদ্র্য বিমোচন;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস;
- সম্পদের আরো সুষম বন্টন;
- বিকেন্দ্রীকৃত, অধিকতর অংশীদারিত্বমূলক সরকার;
- বিভিন্ন দেশ ও দেশের অভ্যন্তরে আরো সুষম, সহনীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং স্থানীয় ভোগের জন্য অধিকতর উৎপাদন।

- পরিবেশের বৈচিত্র সম্মন্ধে আরো ব্যাপক উপলব্ধি, পরিবেশগত সমস্যার স্থানীয়ভাবে গৃহীত সমাধান এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন।

টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার ইতিহাস

১৯৮৭ সালে ইউনাইটেড নেশনস এর সাধারন এ্যসেম্বিতে যখন প্রথম টেকসই উন্নয়ন অনুমোদিত হয়, তখন এর পাশাপাশি শিক্ষার ভূমিকার কথাও স্বীকৃত হয়। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের ধারণা যত পুষ্টিলাভ করে বিভিন্ন অধিবেশনে ESD (Education for Sustained Development)-র ধারণা তত বদ্ধমূল হয়। শিক্ষা সমাজের বাইরের জনগণ দ্বারাই উঝউ সূচিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফোরাম থেকে ESD জন্য একটি বড় ধরনের ধাক্কা আসে। টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে যখনই আলোচনা হয়েছে তখনই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে এ উন্নয়নের মূলে আছে শিক্ষা। পৃথিবীর অনেক দেশে এখনও টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরের জগৎ, যেমন, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, এরা কোর্সের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারপর শিক্ষকদের হাতে দেয়া হয় এটা শেখাতে। কিন্তু শিক্ষক সমাজ ব্যতীত এর ধারণাগত সমস্যার সমাধান কখনওই সম্ভব না।

টেকসই উন্নয়ন ও শিক্ষা

কোন দেশে শিক্ষার হার যখন নিম্নমাত্রার হয়, তখন কৃষি এবং সম্পদ উৎপাদনও সীমিত হয়ে যায়। অনেক দেশে শিক্ষার বর্তমান হার এত নিচে যে এটি উন্নয়নের উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। শিক্ষার উচ্চ মাত্রা শিল্পোন্নয়ন ও চাকরী ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য প্রয়োজন। শিক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের সম্পর্ক বেশ জটিল। গবেষণায় দেখা গেছে জাতীয় উন্নতি এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছতে শিক্ষা মূল ভিত্তিরূপে কাজ করে। শিক্ষা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে, নারীর সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমায়, পরিবেশগত প্রতিরক্ষা সৃষ্টি করে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নীত করে। কিন্তু এ দুয়ের সম্পর্ক সহজ না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চার থেকে ছয় বছরব্যাপী শিক্ষা হ'ল মানুষের প্রবেশদ্বার। শিক্ষা কৃষককে কৃষির নতুন পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়াতে শেখায়, প্রতিকুলতার মুখোমুখি হতে শেখায় এবং বাজারের সিগন্যালে সাড়া দিতে শেখায়। শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষক উৎপাদনকারীর নির্দেশ অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় সার ও কীটনাশক মেশাতে পারে এবং জমিতে তা প্রয়োগ করতে পারে। এর ফলে পরিবেশ এবং জনগণের স্বাস্থ্য প্রতিরক্ষায় সমস্যা হয় না। শিক্ষাগত ভিত্তি তাকে ভূমি উন্নয়ন করতে সাহায্য করে এবং ব্যাংক বা অন্য কোন ঋণদাতা সংস্থায় অর্থ আদান-প্রদান করায় যোগ্যতাধারী করে তোলে।

শিক্ষা নারীকে জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। শিক্ষিত নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং পরিচ্ছন্ন জীবন সম্পর্কে তার স্পষ্ট বোধ তৈরি হয়। সে সঠিক সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং বিয়ের সময়ে ও সাংসারিক ক্ষেত্রে তার নিজ অধিকার সচেতনতা প্রয়োগ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শিক্ষিত নারী ছোট ও স্বাস্থ্যবান সংসার গড়ে তোলায় দক্ষ হয়। সে তার সন্তানদের (ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য) যথাযথ শিক্ষা ও ক্যারিয়ার গঠনে মনোযোগী হয়। শিক্ষা তাদের জীবনধারা বদলে দেয়। শিক্ষা শেখায় কীভাবে সমাজকে সে গ্রহণ করবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতি করবে। সামাজিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে শিক্ষা নারীকে দক্ষ করে তোলে এবং নিজ অঞ্চলের টেকসই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য যোগ্যতাধারী করে তোলে।

মহিলাদের জন্য শিক্ষার অন্য একটি চাহিদা হ'ল প্রাথমিক শিক্ষা। জন্মহার কমানো, নবজাতকের স্বাস্থ্য ও শিশু শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কমপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা জরুরী। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ৯ থেকে ১২ বছরের শিক্ষার প্রয়োজন হয়। অর্থনীতির পরিবর্তন ধারায় নিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে এই স্তরের শিক্ষা থাকা দরকার।

পরিবেশকে ধরে রাখতে শিক্ষা কীভাবে ব্যবহৃত হবে এব্যাপারে কমই গবেষণা হয়েছে, তবে একটি গবেষণা বলছে যে, বর্তমান ভূমির উৎকৃষ্ট ব্যবহারের জন্য, খামার ছাড়া বিকল্প কোন নিয়োগ এবং গ্রামীণ পরিবেশ থেকে বের হওয়ার জন্য নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (কমপক্ষে ৯ম শ্রেণি) পর্যন্ত লেখাপড়া প্রয়োজন হয়। তথ্য ও জ্ঞানসম্মৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং জীবনব্যাপী শিখনের প্রয়োজন হয়। এটি বিদেশ থেকে আমদানী করা প্রযুক্তির মাধ্যমে কমই হয়, বরং নিজ অঞ্চলের উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতায় এই প্রয়োজন মেটে।

টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার তিনটি ক্ষেত্রে শিক্ষা সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেঃ

বাস্তবায়ন-টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য একজন শিক্ষিত নাগরিক অপরিহার্য। একটি দেশের নাগরিকরা কোন স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে তার উপর জাতীয় টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে অথবা সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। যে জাতির উচ্চ হরের স্বাক্ষরতা আছে কিন্তু কর্মদক্ষতা নেই তার উন্নতির সম্ভাবনা কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব জাতির আন্তর্জাতিক বাজার থেকে উচ্চ মূল্যে শক্তি ও তৈরিকৃত পণ্যসামগ্রী কিনতে হয়। এই উচ্চ মূল্য সংগ্রহ করার জন্য তাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসার শরণাপন্ন হতে হয়। এতে প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের শিকার হয় অথবা আত্মনির্ভরশীল পরিবারভিত্তিক খামার থেকে ভূমি কৃষিভিত্তিকে সংরক্ষিত হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য উত্তম সমাজভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন এবং এটি শিক্ষিত জনগণের উপর নির্ভর করে। শিক্ষার হার যত বেশি হয়, উন্নয়ন বিশেষ করে সবুজ বিপ্লব তত বেশি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, প্রযুক্তি প্রশিক্ষিত জনগণ এবং দক্ষ শ্রমিক সম্মৃদ্ধ কোন সমাজ তথ্য-প্রযুক্তি ও সফ্টওয়্যার উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করতে পারে। সমাজ সংক্রান্ত কোন ইস্যু ও সমাজ উন্নয়ন সম্বন্ধীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে এইসব শিক্ষিত নাগরিক সমাজকে রক্ষা করতে পারে, আবার সমাজ উন্নয়নও করতে পারে। যেমন- যেসব নাগরিক জল দূষণের সঙ্গে জড়িত তারা নিকটবর্তী জল উৎসের সাথে যোগাযোগ করে নিজ এলাকার জলের মান সংরক্ষণ করতে পারে।

জীবন মান- জীবনের মান উন্নয়নে শিক্ষা কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা পরিবারের আর্থিক উন্নতি করে; জীবনের সার্বিক অবস্থার উন্নতি করে এবং শিশু মৃত্যুর হার কমায়। পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষার অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের অথ্নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি করতে পারে শিক্ষা। উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তি ও জাতি সর্বক্ষেত্রের বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট (কৃত্রিম) বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে, যেমন, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগ, শিল্পদূষণ, রুগ্নস্বাস্থ্য, অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা, বন উজাড়, মরুকরণ, জলবায়ুর পরিবর্তন, লবনাক্ততা, বৃক্ষনিধন ও প্রাণিকুলের বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্থ করা, অপরিকল্পিত শহরায়ন ইত্যাদি। আমাদের এসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। এর সমাধান করতে হবে এবং ক্ষতি পূরণ করতে হবে।

এখানে বাংলাদেশে যে সব ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হ'লঃ

১. কৃষিজাত সম্পদ ভিত্তি- বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের খাদ্য ও উপার্জনের জন্য কৃষিজাত ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্যকর কৃষিজাত ছাড়া কোন প্রবৃদ্ধি বা দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব না। কৃষি উন্নয়নের জন্য জমি ও পানি দু'টি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণ করে উৎপাদন বাড়ানো আবশ্যক। তাই কৃষি উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ জমি ও পানির পর্যাপ্ত ব্যবহার, তার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রয়োজন।

২. জীববৈচিত্র- কৃষি প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের জন্য জীববৈচিত্র আনয়ন ও তার সংরক্ষণ প্রয়োজন। দেশের কৃষি, বনসম্পদ, পশুসম্পদ ও মৎসসম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন। বৈচিত্রময় বিভিন্ন প্রজাতির জীব চিহ্নিতকরণ, তাদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৩. বায়োমাস- বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮০ ভাগ লোক বাস করে। সেখানে বায়োমাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষ আর সবুজ আচ্ছাদন এবং বিভিন্ন দ্রব্যের অবশেষ কেবল জ্বালানী ও পশুখাদ্যের জোগান দেয় না, বরং ভূমির উর্বরতা রক্ষা করে, ভূমির ক্ষয় রোধ করে, ভূমির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়, আবহাওয়া চিত্রের উন্নতি ঘটায় এবং বন্য প্রাণীর বসতি জোগায়। এক কথায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। জ্বালানীর অভাবে এসব পুড়িয়ে ফেলে মাটিকে মূল্যবান পুষ্টি ও জৈব উপাদান থেকে বঞ্চিত করছে।তাই এর সংরক্ষণ দরকার।

৪. রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের প্রভাব- কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এবং ফসলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নির্বিচারে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব দ্রব্য ভূমির গুণগতমান ক্ষতিগ্রস্ত করছে, পশু ও মৎস সম্পদের ক্ষতি করছে, পানি দূষণ করছে। এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

৫. শিল্প দূষণ- শিল্প-কারখানার অপরিকল্পিত বৃদ্ধি, এর ধোঁয়া ও বর্জ্য বায়ু এবং পানি দূষিত করছে। এমনকি এর ক্ষতিকর প্রভাবে কোন কোন এলাকা বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে।

৬. বন উজাড়- বাংলাদেশের মোট ভূমির ৬ থেকে ৮ শতাংশ প্রাকৃতিক বনভূমি হিসেবে বিবেচিত। এটি কাঙ্খিত মাত্রার চেয়ে অনেক কম। তা ছাড়া অনেক অসাধু ব্যবসায়ী বন কেটে উজাড় করে দিচ্ছে। ভূমির তুলনায় মানুষ বেশি হওয়ার কারণে বসতবাটি নির্মাণে বন কেটে উজাড় করা হচ্ছে।

৭. জলাভূমি ও মৎসসম্পদ- নদী, খাল, বিল, হ্রদ, হাওড় ইত্যাদি মুক্ত জলাভূমি হ্রাস পাচ্ছে। দিঘী, পুকুর, কুয়ো ইত্যাদি মিঠা পানির উৎস দিন দিন কমে যাচ্ছে ও দূষিত হচ্ছে।

৮. ম্যানগ্রোভ পরিবেশ ব্যবস্থা- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি। এটি প্রাকৃতিক কারণে এবং মানুষের দ্বারা ধ্বংস হচ্ছে। মূল্যবান সম্পদসহ এর উৎস বাসস্থান নষ্ট হচ্ছে। বন্য প্রাণী নিধন বন সংরক্ষণের পরিবেশকে নষ্ট করছে।

৯. উপকুলীয় সামুদ্রিক পানিসম্পদ দূষিতকরণ, লবণাক্ততা, পয়ঃনিষ্কাষন সমস্যা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

১০. নগরায়ন- অপরিকল্পিত নগরায়ন, বস্তি, শিল্প, বর্জ নির্গমন ইত্যাদি জনজীবনকে অতিষ্ট করে তুলছে। পরিকল্পিত নগরায়ন জনজীবনে উন্নতি ঘটাতে পারে।

অতএব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে সীমিতকরণ অথবা গতানুগতিক ধারায় প্রবৃদ্ধির অনুবৃত্তি টেকসই উন্নয়ন না, বরং এ ধারণার উপযোগী নতুন উন্নয়ন মডেল প্রবর্তন। এ মডেলে মানুষের কল্যাণকে কেন্দ্র করে প্রণীত হবে সব ধরনের বিনিয়োগ। টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা আমাদেরকে গঠনমূলকভাবে এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিশ্বায়ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে এবং টেকসই সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শান্তি, ন্যায় বিচার ও গণতন্ত্রের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন আনা সহজ হয়।– এ কথা কে বলেছে?
ক. মানবাধিকার সংস্থা
খ. ধরিত্রী সম্মেলন
গ. World Commission
ঘ. ইউনাইটেড নেশনস

২. টেকসই উন্নয়নে মহিলাদের জন্য সর্বপ্রথম চাহিদা কোনটি?
ক. জীবনভিত্তিক শিক্ষা
খ. প্রাথমিক শিক্ষা
গ. নারী উন্নয়ন শিক্ষা
ঘ. গার্হস্থ্য শিক্ষা

৩. ESD-এর ধারণাগত সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র-
ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
খ. চিকিৎসক সমাজ
গ. শিক্ষক সমাজ
ঘ. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. টেকসই উন্নয়ন কী? বুঝিয়ে লিখুন।
২. টেকসই উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান কী? এরা কীভাবে সহাবস্থান করে ব্যাখ্যা করুন।
৩. টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব কীভাবে বিকাশ লাভ করে? ব্যাখ্যা করুন।
৪. বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. "পৃথিবীর সম্পদরাশি ও সম্পদের উৎস যেমন সীমাবদ্ধ, তেমন তার দূষণ সহ্য করার ক্ষমতাও অসীম না"। বক্তব্যটির স্বপক্ষে আপনার ব্যাখ্যা দিন।
২. টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ১.৭: বিশ্বায়ন ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিশ্বায়নের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিশ্বায়নের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- বিশ্বায়নের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বিশ্বায়ন

সারা পৃথিবীতে শিক্ষার উপর বিশ্বায়নের এক প্রকার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বায়ন আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দু'টি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, শিক্ষা সম্বন্ধীয় সাহিত্যে যা নিয়ে অনেক মতান্তর আছে। প্রশ্ন দু'টির একটি হ'ল, বিশ্বায়ন কী? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে বিশ্বায়ন হল একটি বহুমুখী অবস্থা যার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্তরে নানা ধরনের গুরুত্ব আছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হ'ল, সারা পৃথিবীতে বিশ্বায়ন কীভাবে শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করছে? এর উত্তরে বলা যায় যে শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে বিশ্বায়নের সরাসরি প্রভাব খুব সামান্য। তবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শের উপর এর প্রভাব অনেক বেশি। এইসাথে বলতে হয় যে এখন যে Neo-Liberal Economy আছে সেখানেও এর প্রভাব যথেষ্ট। ইদানিং ব্যবস্থাপনা এবং পেশাগত ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ধরার জন্য শিক্ষানীতির পরিবর্তন হচ্ছে। সেখানে বিশ্বায়ন শিক্ষাকে ব্যক্তিমালিকানাধীন করার ব্যাপারে জোর দিয়েছে। এই পাঠে আমরা বিশ্বায়ন ও শিক্ষার উপর বিশ্বায়নের প্রভাব এ দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

বিশ্বায়নের স্বরূপ

বিশ্বায়ন কী, এর কারণ ও ফলাফল নিয়ে বহু জায়গায় বহু রকমভাবে লেখালেখি হয়েছে এবং সবখানেই এটি বলা হয়েছে যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও স্বতন্ত্র নতুন বিষয়। দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবী খুব দ্রুত নানাবিধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি একক অর্থনীতিতে সমন্বিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবসা, উৎপাদনের আন্তর্জাতিকতা এবং অর্থনৈতিক বাজার, ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এর দ্বারা প্রবর্তিত পণ্যদ্রব্যের আন্তর্জাতিকতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ব্যাপকভাবে বলা হয় যে, সম্প্রতি সমসাময়িক বিশ্বায়ন কোন একক অবস্থা নয় বরং এটির প্রকৃতি বহুমুখী এবং এটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্তরের বিবিধ গুরুত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ১৯৯২ সালে সমাজবিজ্ঞানী Ronald Robertson লিখছেন, সার্বিকভাবে বিশ্বায়ন হ'ল পৃথিবীকে ঘনীভূত করে ছোট করে নিয়ে আসা এবং এর চেতনাকে তীক্ষ্ণ করা। তিনি বলছেন যে, বাস্তবতা বদলে যাচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও পৃথিবীর মধ্যে তার অবস্থানেরও পরিবর্তন হচ্ছে।

স্যাটেলাইট টেলিভিশন ব্যবহারের ফলে টেলিযোগাযোগের যে উন্নতি হয়েছে এবং বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারের যে আন্ত:যোগাযোগ, এসবই বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের বিভিন্ন রূপ। প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক

সমাজ জীবনের সমস্ত দিক যেমন, সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে অপরাধ জগৎ, অর্থনৈতিক দিক থেকে আধ্যাত্মিক দিকে পৃথিবীব্যাপী জাতিতে জাতিতে যে আন্ত:সংযুক্ততা সেখানে বিস্তৃত ও ত্বরান্বিত হয়। সমসাময়িক বিশ্বায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক পরিবর্তন বৈশ্বিক অর্থনীতির আন্তর্জাতিক পুরসভার (TNCs) প্রাধান্যের উপর প্রতিফলিত হয়। ধরা হয় এই TNCs অর্ধ পৃথিবীর মূল্য সৃষ্টিতে এবং বাকী অর্ধেক পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতির দায়িত্বে থাকে। বিভিন্ন মহাদেশে পুরসভা বিনিয়োগ কার্যাবলি এবং সমন্বিত উৎপাদনের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক আরোপ করে। এই আরোপ প্রক্রিয়া জাতীয় বিবেচনায় চালিত হয় না, বরং তাদের নিজ মূল্য হ্রাস করা এবং মূল্য বৃদ্ধির লাভ্যাংশ (Boost Profit) প্রাপ্তির প্রয়োজনে চালিত হয়। Boost Profit হ'ল একটি প্রক্রিয়া যেটা নিম্ন শুল্কযুক্ত দেশসমূহে পুরসভার নিজ এলাকা এবং এর সাথে ব্যতিক্রমী একাউন্ট যেখানে ট্যাক্স দিতে হয় না, তার ব্যবহারের সাহায্যে অর্জিত হয়।

স্যাটেলাইট যোগাযোগের এবং কম্পিউটারের তথ্য নেটওয়ার্কের উদ্ভাবন অর্থ এই নয় যে শুধু প্রতিদিন তাৎক্ষণিকভাবে এক হাজার কোটি ডলার সারা পৃথিবীতে আদান-প্রদান হচ্ছে, এর সাথে শ্রমিকের আদান-প্রদানও হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, আমেরিকায় ব্যাংকগুলোর কল সেন্টারের কাজ ভারতীয় শ্রমিক করে। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে বসে ভারতীয় প্রতিনিধি আমেরিকার জনসাধারণের ব্যাংকের যাবতীয় তথ্য প্রদান করে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার আসন্ন শক্তির অর্থ হ'ল জাতীয় অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির পণ্যদ্রব্য ও সেবাকে একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে চলতে হয় এবং এর উৎপাদন মূল্য বৈশ্বিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। এটা পরবর্তীতে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করে। এ সচেতনতা শিল্পপতিদের এবং জাতীয় নীতি নির্ধারকদের বিষয়কেন্দ্রিক সচেতনতা। একে Robertson এর বৈশ্বিক চেতনার রূপ হিসেবে দেখা যায়। এই সচেতনতা তাদের বৈশ্বিক বাজারের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন- বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন, বিশ্ব ব্যাংক, IMF, OECD ইত্যাদি আন্তর্জাতিক পুরসভার অর্থনৈতিক প্রাধান্যের সাথে neo-liberalism এর প্রধান বৈশ্বিক রাজনৈতিক আদর্শকে সংগঠিত করে। নিম্ন উৎপাদন মূল্যের জন্য এইসব অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং রপ্তানীমুখী অর্থনীতিকে উন্নীত করার জন্য বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা হয়। ট্যাক্স এর মান কম রাখা হয়, তা না হলে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী ট্যাক্স মুক্ত (Tax-Friendly) স্থানে তার ব্যাবসা সরিয়ে নিয়ে যায়। এ ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্ম দেয়। অনেক Scandinavian দেশ, যেমন, সুইডেন, জার্মানি, নরওয়ে ইত্যাদি উচ্চ মানের জনপ্রশাসনিক (যেমন- শিক্ষা, জনকল্যাণ ইত্যাদি) ফান্ড তৈরি করার উদ্দেশ্যে উচ্চ মাত্রার শুল্ক ধার্য করে। কিছু তাত্ত্বিক যেমন, Ohmae (১৯৯৫) বলছেন যে, একটা দল আছে যাদেরকে 'Hyperglobalists' বলা হচ্ছে তারা এই তত্ত্বটিকে এভাবে দেখেন যে এ তত্ত্বের কারণে যারা জাতীয় প্রশাসনে আছেন তারা নিজেদের অর্থনীতির উপর ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং সাধারণ যে চিন্তা, যে রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অংশ বা Unit সে চিন্তাধারণাটিও ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। তারা বলছেন যে, মুক্ত বাণিজ্যের আদর্শ, ভোক্তার রুচি, বাজারজাতকরণ ও ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক কোন একক জাতীয় সরকারের থেকে অনেক বেশি শক্তিমান এবং প্রভাবশালী।

আমরা পূর্বেই জেনেছি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার শুধুই বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে, তা নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বও আছে। সমাজবিজ্ঞানী Castells (1996) পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক বিনিময়ের নেটওয়ার্কের উপর বৈশ্বিক সমাজ গড়তে সংস্কৃতি ও তথ্য বিনিময়ের উপর জোর দিয়েছেন, যেখানে সময় ও Space সংকুচিত। যারা জ্ঞানী ও তথ্যসমৃদ্ধ তারা এই নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ করে অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং সে ক্ষমতা তারা ব্যবহার করে। অনেক তাত্ত্বিক এটাকে এভাবে দেখছেন যে মানুষ কোন এলাকার অধিবাসী সেটা কোন বিষয় না, বরং তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। একজন সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিক Giddens (1990) বলছেন যে, বিশ্বায়ন দু'টি বিতর্কিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতা তৈরি করে: বৈশ্বিক স্বাভাবিকতার যে চাপ তা একদিকে স্যাটেলাইট টেলিভিশন, মিডিয়া শিল্প এবং McDonals এর বৈশ্বিক বিস্তৃতির সাথে সংযুক্ত এবং অন্য দিকে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও পরিচয় গঠনের চাপ। উদাহরণ হ'ল, বিভিন্ন দলের যেমন, মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠি ইত্যাদির বৈশ্বিক আদর্শ বা মতবাদ প্রতিহত করা।

বিশ্বায়নের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য যা শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তার বর্ণনা দেয়া খুব সহজ কাজ নয়, তার পরেও এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হ'ল:

১. অর্থনৈতিক- বিশ্বায়ন হ'ল এক প্রকার ক্রান্তিকাল, যার কর্মস্থল সংগঠনের Fordist থেকে Post-Fordist রূপে উত্তরণ হয়; আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনের অগ্রগতি এবং ভোগ রীতির বৃদ্ধি হয়; পণ্য ও শ্রমিক পরিবহনে প্রতিবন্ধকতা কমে যায় এবং জাতীয় প্রান্ত পার হয়ে বিনিয়োগ হয়; এবং সঙ্গতিপূর্ণভাবে সমাজে শ্রমিক ও ভোক্তার ভূমিকায় নতুন চাপ প্রয়োগ হয়।

২. রাজনৈতিক- জাতি তথা রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, অথবা কমপক্ষে জাতীয় স্বতন্ত্রতার ক্ষয় হয়। নাগরিক হিসেবে ঐক্যবদ্ধতার ধারণা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ঐক্যবদ্ধতা হ'ল নাগরিক হিসেবে তার যথার্থ ভূমিকা, অধিকার, আইনগত বাধ্যবাধকতা ও সমাজে তার প্রতিষ্ঠা।

৩. সাংস্কৃতিক- বিশ্বায়নের কারণে কোন দেশে একাধিক সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলাফল পরস্পর বিপরীতধর্মী হতে পারে। যেমন, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ইসলামী প্রভাবে বিচিত্র পোশাক ও অন্যান্য সংস্কৃতির প্রচলন চোখে পড়ে। আবার পশ্চিমা সংস্কৃতি যেমন, নাইট ক্লাব, 31st night ইত্যাদিও এদেশে প্রবেশ করেছে।

৪. শিক্ষাগত- ইদানিংকালে মানুষ বিশ্বায়নের উদারনীতির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক বিশেষভাবে উপলব্ধি করছে। বিশেষ করে দ্বিপার্শিক, বহুপার্শিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনে শিক্ষার আলোচ্যসূচি প্রতিফলিত হয়। মূল্যায়ন, অর্থায়ন, মূল্য নিরূপণ, মান নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম, নির্দেশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব নীতি নির্ধারণ করা হয় তা সরাসরি বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবান্বিত। এরকম অবস্থায় নিজ দেশের প্রতিক্রিয়া জানতে হবে, যাতে শিক্ষার বাজার পদ্ধতি বা শিক্ষার বিনিময় কৌশল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়। শিক্ষায় উন্নত মানের মডেল প্রয়োগ করা হয়, যা বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন, ব্যবসা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি থেকে নেয়া হয়।

শিক্ষা ও বিশ্বায়ন

সারা পৃথিবীতে শিক্ষার গঠন এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ার উপর সমসাময়িক বিশ্বায়নের প্রভাব সম্বন্ধে নানা ধরনের মতবাদ আছে। বিশ্বায়নের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক বেশ জটিল। অধিকাংশ মতবাদ এই জটিলতা থেকে মুক্ত হওয়ার দুসাধ্য কাজটি করে। অর্থাৎ আমরা সেই সব মতবাদ থেকে বিশ্বায়নের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক বুঝতে পারি। এইসব

মতবাদ বিশ্বায়নের উদারনীতির সহচর হিসেবে বৈশ্বিক রাজনৈতিক আদর্শকেও বুঝতে সাহায্য করে। Carnoy (1999) বলছেন, অধিকাংশ দেশে বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব কমিয়ে আনা প্রয়োজন। দশ বছর পরে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর এ রকম মূল্য নির্ধারণ যে ভিন্ন হবে তার নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়।

পশ্চিমা শিল্পপ্রধান দেশগুলো বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে বৈশ্বিক সচেতনতা সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু সংযোজন করে, তবে এ বিষয়বস্তুগুলো খুব উঁচু মানের ছিল না। বিশ্বায়নের সাথে জড়িত কিছু প্রক্রিয়ার একটি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, ইংল্যান্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণরীতিতে এই প্রভাব কার্যকরী হয়, কিন্তু শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুতে এ প্রভাব পড়ে না। এ হ'ল শ্রেণিতে পারস্পারিক মিথষ্ক্রিয়ায় ব্যবহৃত Whiteboard এবং ক্রমবিকাশমান ICT র ব্যবহার। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণের উপর একটি গবেষণায় দেখা গেছে ICT ক্লাসে শিক্ষার্থীরা এককভাবে, যুগলে বা ছোট দল গঠন করে একটি বা দু'টি কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে শিক্ষক যখন শেখাচ্ছেন বা তদারকী করছেন তখন ক্লাসের বাকী শিক্ষার্থীরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছে। দশ বছর পর একই বিদ্যালয়গুলোতে অনুরূপ গবেষণায় দেখা গেল প্রায় সব ক্লাসে পারস্পারিক মিথষ্ক্রিয়ায় ব্যবহৃত Whiteboard আছে। এতে শিক্ষকরা শিক্ষণের জন্য ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। Carnoy (1999) আবার বলছেন, যেখানে বিশ্বায়নের প্রভাব শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর সীমিত, সেখানে এই প্রভাব অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক আদর্শের উপর অনেক বেশি। যেমন, বৈশ্বিক সংগঠনে কাজের উপর পরিবর্তন এনে অত্যন্ত দক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ শ্রমিককে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হলে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা দুক্ষেত্রেই তারা পুরষ্কৃত হয় এবং অনুপ্রেরণা পায়। অনেক দেশে সাংগঠনিক উপযোজন নীতিমালা (Structural adjustment policies) এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যেন বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয়। ফলে শিক্ষার ব্যয়ভার কমে যায় এবং শিক্ষা ব্যক্তিমালিকানাধীন হয়।

বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিশ্বায়নের অন্য একটি ফলাফল হ'ল জাতীয় শিক্ষার গুণাগুণ গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের উপর জোর দিয়ে ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিকভাবে তুলনা করা। এখানে বিদেশী ভাষা এবং যোগাযোগ দক্ষতার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির উপরও জোর দেয়া হয়। ১৯৯৮ সালে ইংলিশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে New Labour Government এর জাতীয় সংখ্যাগত কৌশল (National Numeracy Strategy) সরাসরি তাইওয়ানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষণ চর্চা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এটি বিশ্বায়নের প্রভাবের একটি উদাহরণ। শিক্ষাগত অর্জনের আন্তর্জাতিক তুলনামূলক শিক্ষার ফলাফলে দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমাজ যেমন, তাইওয়ানের তুলনায় ইংল্যান্ড গণিত চর্চায় অনেক পিছিয়ে আছে। ইংল্যান্ডের একটি টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখে আমরা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হতে পারি। সেখানে দেখা যায় তাইওয়ানের প্রাথমিক স্কুলে Professor David Raynolds-এর গণিত বিষয়ের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রেণি শিক্ষণ পদ্ধতি। সেখানে শিক্ষার্থীদের একক বা দলীয়ভাবে গণিত শিক্ষণ দেয়া হয়, যা তখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডে হয়নি। এ কথা বলা যায় যে, শিক্ষাগত উদ্ভাবন যখন স্থান পরিবর্তন করে, তখন এক জায়গার সংস্কৃতিতে যা ভাল ফল দেয়, তা অন্য জায়গার সংস্কৃতিতে ভাল ফল নাও দিতে পারে।

শিক্ষার উপর বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা শেষ করার পূর্বে দু'টি মন্তব্য করা যেতে পারে। একটি হ'ল বিশ্বায়নের প্রভাব সারা পৃথিবীব্যাপী খুব অসম ফলাফল সৃষ্টি করে। এই ফলাফল কিছুটা ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার কারণে ঘটেছে। যেমন- আমেরিকা, ইউরোপ ও নতুন শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলকে পৃথক করা যায়, এইভাবে যে, এ অঞ্চলগুলো সারা পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের প্রাথমিক ভাবনা এখান থেকেই সূচিত হয়েছে। এভাবে পৃথিবীকে তিনভাবে ভাগ করা যায়। যারা বিশ্বায়ন সূচনা করেছে, যারা বিশ্বায়নকে গ্রহণ করেছে এবং যারা বিশ্বায়নের কারণে দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। বিশ্বায়নকে যারা গ্রহণ করেছে, উদাহরণ হিসেবে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, চীন ইত্যাদি। যারা দুর্ভোগের শিকার হয়েছে, তাদের উদাহরণ হ'ল জিম্বাবুয়ে, কঙ্গো, কেনিয়া ইত্যাদি।

অন্য আর একটি মন্তব্য হ'ল শিক্ষায় বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়, Hyperglobalists যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তার বিপরীত কথা হল, শিক্ষার উপর বিশ্বায়নের প্রভাব কমে যাবে যদি শিক্ষার উপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ শক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মালয়েশিয়া, নিউগিনি ও অষ্ট্রেলিয়ার একটি কেস স্টাডিতে দেখা গেছে, এমন কোন বদ্ধ পরিকর পথ নেই যেখানে বিশ্বায়ন কার্যকরী হয়, বরং বিশ্বায়নের বিভিন্ন চাপ প্রতিরোধের এবং পিছনে হটানোর অনেক সুযোগ আছে। আবার Green et al. জীবনব্যাপী শিক্ষার বিশ্বায়নগত ধারণা ব্যাখ্যা করার এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করার পথ দেখিয়েছেন। এমনকি একই দেশের ভিতর বিভিন্ন পথের নানারূপ বৈচিত্র আছে যার মধ্যে শিক্ষার উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ও চাপ দেশীয়ভাবে মধ্যস্থতা করে কমান যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিশ্বায়নের প্রকৃতি বহুমুখী- এ কথা কেন বলা হয়েছে?
ক. এটি রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবান্বিত
খ. শিক্ষার বহুমুখীতার সঙ্গে সম্পর্কিত
গ. এটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে তাই
ঘ. এটি বিবিধ গুরুত্বের সাথে সম্পর্কিত

২. এই সচেতনতা শিল্পপতিদের বৈশ্বিক বাজারের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করে- এখানে কোন সচেতনতার কথা বলা হয়েছে?
ক. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সচেতনতা
খ. বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সম্মন্ধে সচেতনতা
গ. বৈশ্বিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সচেতনতা
ঘ. কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা

৩. কোনটি বিশ্বায়নের প্রভাব নয়?
ক. বিষয়বস্তু শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা
খ. শিক্ষা ব্যক্তিমালিকানাধীন হওয়া
গ. শিক্ষার ব্যয়ভার কমে যাওয়া
ঘ. আন্তর্জাতিকভাবে তুলনা করা।

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিশ্বায়ন কী? বুঝিয়ে লিখুন।
২. বিভিন্ন দেশে সাংগাঠনিক উপযোজন নীতিমালা (Structural adjustment policies) প্রয়োগ করার কারণ কী?
৩. বিশ্বায়নের সাথে অর্থনৈতিক পরিবর্তন কীভাবে বৈশ্বিক পরিবর্তনে প্রতিফলিত হয়? ব্যাখ্যা করুন।
৪. Carnoy শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব কমিয়ে আনার কথা বলেছেন কেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার উপর বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষার ঝুঁকি ও প্রসার আলোচনা করুন।
২. বিশ্বায়নকে গ্রহণ করে শিক্ষায় বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থান বিশ্লেষণ করুন।